AL-BALAGH 1438 | 2017 | ISSUE 2

পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব

# আল বালাগ

# البلاغ

## সূচী

# এ চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে যদিও আমরা ঢের পিছিয়ে আছি দাজ্জালী মিডিয়ার চেয়ে। তবে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টাতো চালিয়ে যেতে হবে – সম্ভব না বলে হাত-পা গুটিয়ে থাকলে তো হক-বাতিলের এ লড়াইয়ে আমাদের ভাইদের কলজে-ছেঁচা কোরবানির সাথে ছলনা করা হবে শুধু!

দেখুন, আজ কুফ্ফাররা গোয়েবলসীয় কায়দায় কিভাবে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যের গায়ে সত্যের প্রলেপ মেখে উম্মাহকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিত হারা যুদ্ধ তারা এভাবে জিতে যাচ্ছে। সিরিয়ার দিকেই দেখুন– আলেপ্পো, ওয়াদি-বারাদা'য় তারা এ কৌশলই প্রয়োগ করেছে। মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে তাদের পদলেহি মিডিয়াগুলো দিনকে রাত, রাতকে দিন বলে প্রচার করছে। আর আমরা সেগুলো গিলেও যাচ্ছি নির্বিকারভাবে!

তারা প্রচার করে মুজাহিদরা সন্ত্রাসী, বর্বর, শিক্ষাবিরোধী–আমরা তালি বাজাই। তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই। ইসলামের দন্ডবিধি নিয়ে যাচ্ছেতাই বলে বেড়ায়; আর আমরা শুধু দাঁত কামড়ে দায়িত্ব পার করি।

পাশ্চাত্য মিডিয়ার এ সয়লাবের মধ্যেও মুজাহিদগণ যতটুকু প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন–তাতেই তাদের সব কৌশল মার খাচ্ছে। কতোভাবে চেষ্টা করেছে জিহাদি-চেতনাকে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে দিতে। পেরেছে? ইনশাআল্লাহ পারবেও না; বরং নাইন-ইলেভেনের যৌক্তিকতা দিন-দিন স্পষ্ট হচ্ছে।

বিশ্বের নানাপ্রান্তে মুজাহিদগণ উম্মাহর কল্যাণে কী কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার সঠিক চিত্র যদি তুলে ধরা যেত– তাহলে সুপার পাওয়ারদের গোমর ফাঁস হয়ে যেত কবেই।

সোমালিয়ায় মুজাহিদরা জাকাতবিধান দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে মানুষের দুর্দশা লাঘবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ কেন তাদের সঙ্গ দিচ্ছে– তার রহস্য এখানেই লুকিয়ে আছে। আফগানিস্তানে ন্যাটোর সমরায়োজন তালেবান-মুজাহিদরা কীভাবে বালুর ঢিবিতে পরিণত করেছে; এ তথ্য যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ মিডিয়ায় চিত্রিত হতো–তাহলে অবস্থা কোথায় দাঁড়াতো?

ময়দানের লড়াইয়ের চেয়ে এ লড়াইয়ের গুরুত্ব কম নয়। আর এ লক্ষেই তিতুমীর মিডিয়া কাজ করে যাচ্ছে। এটি তারই একটি প্রয়াস।

আশাতো আছে অনেক কিছুরই। তবে আপাতত প্রতি পক্ষকাল অন্তরন্তর আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা আমরা করবো–আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যদি সহায় হোন। নিশ্চয় আমরা তাঁর করুণাপ্রত্যাশী।

**-তিতুমীর মিডিয়া**

# আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন

মুফতি হাসান আব্দুল বারী

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ: আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। অন্যথায় তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। -আনফাল:৪৬

উল্লিখিত আয়াতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। সমাজবদ্ধ জীবনের পাশাপাশি জিহাদের ময়দানে এ বিষয়গুলোর তাৎপর্য বহুমাত্রিক।

১. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর।

২. وَلَا تَنَازَعُوا তোমরা পরস্পরে বিবাদে জড়িয়ো না।

৩. واصْبِرُوا এবং তোমরা ধৈর্যধারণ কর।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এ-তো যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতার নিয়ামক শর্ত। এটা ছাড়া উত্থান নয়, ব্যর্থতা আর পতনই তরান্বিত হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন যুদ্ধের ময়দানের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলীর প্রতি সমর্পিত থাকে। কাফেলার সকলেই যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিবে শরীয়াহর সিদ্ধান্তের উপর, তখন পারস্পরিক বিবাদের আর প্রশ্নই আসে না। কারণ বিবাদ সাধারণত দুই কারণে হয়–

এক. নেতৃত্বের লালসা। দুই. খ্যাতির বাসনা। আর প্রবৃত্তির মায়াবী আকর্ষণ মূলত এসবের পিছনে কাজ করে। ফলে সে অবলীলায় অযাচিত কাজ করে বেড়ায়। আত্মম্ভরিতার এ-মোহে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর এভাবেই তার জিহাদ -যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সে শুরু করেছে অবশেষে তা দলান্ধতা, মতান্ধতার কাদাজলে মুখ থুবড়ে পড়ে।

এ স্বেচ্ছাচারিতা তাকে শুধু নয়; পুরো বাহিনীকে পথচ্যুত করেই তবে ক্ষান্ত হয়। কুরআনে এর ফল বলা হয়েছে–ব্যর্থতা-কাপুরুষতা।

মুফতী শফী রহ. একে দুভাগে ভাগ করেন– এক. দলীয়ভাবে দুর্বলতা ও কাপুরুষতা ছড়িয়ে পড়বে। দুই. শত্রুর দৃষ্টিতে হালকা ও তুচ্ছ হিসেবে পরিগণিত হবে। বস্তুত, একতা ও মান্যতাই মুমিনের যুদ্ধজয়ের শক্তি ও কৌশল। তবে হ্যাঁ, সবার রুচি, বোধ ও চিন্তাশক্তি এক হবে– এমনটা ভাবা ভুল। মনের অমিল হতে পারে, যৌক্তিক মতভেদ থাকতে পারে, থাকবেও– তবে তা যেন নিজের মত সবার ওপর চাপিয়ে দেয়ার উগ্রমানসিকতার বহি:প্রকাশ না হয়। এ জন্যই কুরআনে

وَلَا تَنَازَعُوا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ولا تختلفوا নয়।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা আনুগত্যের ও বিবাদ থেকে বাঁচার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। কারণ, ব্যক্তিস্বার্থে কেউ জিহাদে অবতীর্ণ হয়নি; তাই মতের বিরুদ্ধে আমীর সিদ্ধান্ত দিলে তার অসুবিধে কোথায়? হ্যাঁ, একটু খারাপ লাগতে পারে–মানবিক দুর্বলতা বলে কথা। তাই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যধারণ করতে বলেন। কারণ এর ফল সুমিষ্ট। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন–নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের সাথে আছি।

আল্লাহ তাআলা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে জিহাদরত আমাদের ভাইদের এ আয়াতের মর্ম অনুধাবন ও বাস্তবায়নের তওফিক দিন।

ব্যক্তিস্বার্থ, দলস্বার্থের চেয়ে উম্মাহর স্বার্থ–সর্বোপরি মহান আলাহ তাআলার সন্তুষ্টি তথা, দীনের বিজয়কে তরান্বিত করার তাওফীক দিন। আমিন। [সূত্র: মাআরেফুল কুরআন ও তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন]

# জিহাদের প্রতিদান লাভের শর্তাবলী

আবুল হাসান সাঈদ আস সাহমী

الحمد لله الذى وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد

পৃথিবীতে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পথ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল—লড়াই— করা। যারা প্রতিনিয়ত ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; সেই দাজ্জালী কুফ্‌ফার শক্তি ভালোভাবেই জানে- একমাত্র আল্লাহর পথের অস্ত্রধারী মুজাহিদগণই তাদের অসাড় দাম্ভিকতাকে সমূলে বিনাশ করতে সক্ষম। আর এ জন্যই তারা আল্লাহর পথের অস্ত্রধারী মুজাহিদগণ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের শত্রু মনে করে না। যদিও আমাদের মুসলিমদের বহু লোকই কুরআন-হাদিসের প্রকৃত শিক্ষা ও বাস্তবতা বিমুখ হওয়ায় এ সহজ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারছে না।

যাইহোক, আল্লাহ তাআলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই একজন মুজাহিদ হতে হবে। মুজাহিদ হওয়া ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানা সম্ভব নয়; এ কথা শতভাগ সত্য। তবে জিহাদের পথে চললেই যে কেউ জিহাদের প্রতিদান পেয়ে প্রকৃত মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে; বিষয়টি এমনও নয়। কারণ, মহান আল্লাহর দরবারে প্রত্যেকটি আমল কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

কেউ নামাজ আদায় করলেই যেমন নিশ্চিতভাবে বলা যায় না- তার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছে। ঠিক তেমনি-ভাবে জিহাদের শর্তাবলী না মেনে কেউ জিহাদ করলেই, তার জিহাদ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছে; এ কথা বলাও সমীচীন নয়। যথাযথ শর্তাবলী না মানা হলে জিহাদের মত মহান ইবাদাতেরও ফজিলত লাভ করা যায় না; যদিও বাহ্যিকভাবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন- যুদ্ধ দুই প্রকার: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করল, ইমামের আনুগত্য করল, উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ করল, সঙ্গীকে সহায়তা করল; এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকল; তার নিদ্রা ও জাগরণ সবই প্রতিদান যোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল যশ, খ্যাতি ও লোক দেখানোর জন্য, ইমামের অবাধ্যতা করল ও জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করল; সে কিছুতেই যথাযথ প্রতিদান নিয়ে ফিরতে পারবে না (সে খালি হাতে ফিরবে)। - *আবু দাউদ: ২৫১৫*

মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে এ হাদিসে যুদ্ধ দুই প্রকার দ্বারা যোদ্ধা দু'ধরনের বুঝানো হয়েছে। যে যোদ্ধার মাঝে উপরোল্লেখিত হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি গুণ পাওয়া যাবে; সে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার প্রতিদান লাভ করবে।

## জিহাদের প্রতিদান লাভের প্রথম শর্ত

আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে হবে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির আশায়। এ জন্য অন্তরে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের বিশুদ্ধ নিয়ত রাখতে হবে। মুমিনের জিহাদ হতে হবে, আল্লাহর পবিত্র কালিমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে; কোন রকমের যশ, খ্যাতি বা লোক দেখানোর জন্য নয়।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল– কোন ব্যক্তি গনিমতের জন্য যুদ্ধ করে, আবার কেউ বা করে সুখ্যাতির জন্য, কেউ করে লোক দেখানোর জন্য; সুতরাং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথের মুজাহিদ শুধু ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে। - *বুখারী: ২৮১০*

সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাঁরই কালিমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদ করতে হবে।

## জিহাদের প্রতিদান লাভের দ্বিতীয় শর্ত

ইমামের আনুগত্য করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

তোমরা (আমিরের কথা) শোনো! এবং (আমিরের) আনুগত্য করো! যদিও তোমাদের ওপর কোন নিগ্রো ক্রিতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশের মত। (অর্থাৎ কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)! - *বুখারী: ৭১৪২*

## জিহাদের প্রতিদান লাভের তৃতীয় শর্ত

আল্লাহর রাস্তায় উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজের উত্তম মাল ব্যয় করতে চায় না; সে কিভাবে নিজের জান উৎসর্গ করবে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

তোমরা কিছুতেই পূণ্যের স্তরে উপনীত হতে পারবে না; যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। - *সূরা আলে ইমরান: ৯২*

## জিহাদের প্রতিদান লাভের চতুর্থ শর্ত

সঙ্গিদের সহায়তা করা। আর আল্লাহর রাস্তার সৈনিকগণ একে অপরকে সর্বোত্তম সহায়তা তখনই করতে পারবে; যখন একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিনয়ী হবে। এ জন্য হতে হবে সাথীদের সাথে খুব কোমল ও উদার। পবিত্র কুরআনে সূরা ফাত্হের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল; তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। - *সূরা ফাত্হ: ২৯*

আর এমনই গুণে গুণান্বিত হতে হবে আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত বীর সৈনিকদের। হতে হবে পরস্পর সীসা ঢালা প্রাচীরের মত।

## জিহাদের প্রতিদান লাভের পঞ্চম শর্ত

সব ধরনের ফাসাদ থেকে বিরত থাকতে হবে। একজন অপরজনের দোষ চর্চা, গীবত, হিংসা, এক কথায় ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কর্মকান্ড অবশ্যই একজন মুজাহিদকে পরিহার করতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত একজন যোদ্ধার মাঝে যদি এই পাঁচটি শর্ত বা বৈশিষ্ট্যের কোন একটিরও ঘাটতি থাকে, অথবা তার মাঝে হাদিসে বর্ণিত বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়; তাহলে সে জিহাদের মত মহান ইবাদাতে শামিল হয়েও প্রতিদান লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের শর্তাবলী মেনে তাঁরই পথে অবিচলভাবে জিহাদ করার তাওফিক দান করুন। জিহাদের সকল আজরসহ শাহাদাতের নেয়ামত লাভে ধন্য করুন। আমীন!

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল কায়েদার বার্তা
শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

**এক.** আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করা। শুধু তারই ইবাদত করা, শাসন তার শরীয়ত অনুযায়ী করা, একমাত্র তার কাছেই চাওয়া, আচার-অনুষ্ঠান তার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা।

**দুই.** ইসলামী শরীয়তের দিকে আহ্বান করা। অন্য সকল বিশ্বাস, আইন ও রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা। চাই তা গণতন্ত্র হোক, যা কিনা জনগণের হাতে শাসনকে অর্পন করে। অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংগঠন হোক, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো মিলে প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম দেয়া হয়-জাতিসংঘ।

**তিন.** উম্মাহকে তাওহীদের কালিমার অধিনে ঐক্যবদ্ধ করা। কুরআনুল কারীম, সুন্নাতে মুতাহ্হারাহ, খোলাফায়ে রাশেদার জীবনী, সাহাবায়ে কেরাম রাযি., তৃতীয় শতকের পুণ্যময় মানুষগুলোর জীবন যা স্পষ্ট করে গেছে। যার সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন- 'সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ তারপরে তৎপরবর্তীরা তারপর তৎপরবর্তীরা।'

**চার.** মুসলিম জাতির মাঝে জিহাদের আমলকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। যেন, তারা তাদের ভূমিগুলোকে দেশীয় কুফ্ফার ও তাদের প্রতিনিধিদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে । মুসলিম ভূমিতে কাফেরদের অনুপ্রবেশ ও দখল করার সুযোগদানকারী সকল চুক্তি-সমঝোতা, আন্তর্জাতিক সমাধানকে বর্জন করা। যেমন- ইজরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল, রাশিয়া কর্তৃক মধ্য এশিয়া ও ককেশাস দখল, ভারত কর্তৃক কাশমীর দখল, স্পেন কর্তৃক সিউটা ও মিলিলিয়া দখল, চীন কর্তৃক পূর্ব তুর্কিস্তান দখল। আর উম্মাতের মুজাহিদদেরকে আমরা প্রত্যেক জিহাদী ময়দানের পরিস্থিতি ও এর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ যুগের মিথ্যাপ্রভু আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী জিহাদ করার আহ্বান করছি।

**পাঁচ.** তার সাথে সাথে মুসলিম বন্দীদের মুক্তির জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

**ছয়.** অবিরতভাবে মুসলিমদের ধন-সম্পদের উপর যে লুটপাট চলছে তা বন্ধ করা।

**সাত.** সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে দূর্নিতিবাজ শাসকের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করা। ইসলামী শরীয়ত ও হুকুমের অধীনে জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা মুসলিম উম্মাহকে বুঝানো। তাদেরকে পূর্বসূরীদের অনুসরণের প্রতি উৎসাহ দেয়া, যাতে করে ইসলামী-বিশ্ব দালাল শাসক হতে মুক্তি লাভ করে।

**আট.** মুজাহিদদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির প্রতি আহ্বান করা। তাদেরকে ক্রুসেডার, স্যেকুলার,সাফাভী, বৌদ্ধ, হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য, সুসংগঠিত ও একতাবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা।

**নয়.** নবুয়াতের আদলে খেলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা। যা মুসলমানদের পছন্দ ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, পারস্পরিক বোঝাপোড়া প্রসারিত করবে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবে, অধিকার ফিরিয়ে দিবে, অত্যাচারিতদের সাহায্য করবে। যেখানে কোন গোত্রপ্রীতি, দেশভক্তি থাকবেনা। থাকবেনা কোন সীমানা, যা দখলদাররা আমাদের উপর বেধে দিয়েছে। প্রতিটি মুসলিম ভূমি নিরাপদ থাকবে। ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তাদেরকে সমতার বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

**দশ.** মুসলিমদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। শরীয়তে যা কিছু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো থেকে বিরত থাকবে, সীমালঙ্গন করা থেকে বিরত থাকবে চাই তা বোমা হামলা, হত্যা কিবা জবর দখল করা, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার দ্বারা হোক।

**এগার.** অত্যাচারীর ও সীমালঙ্গনকারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত, দূর্বলদের সাহায্য করা চাই সে মুসলিম হোক অথবা কাফের হোক। যারা নির্যা-তিতদের সাহায্য করে তাদের উৎসাহ দেয়া ও সাহায্য করা, যদিও সে অমুসলিম হয়।

যদি এগুলো অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তা আমাদের জন্যে গৌরবের ও সম্মানের বিষয়। কেয়ামত দিবসের জন্যে আমাদের গচ্ছিত সম্পদ।

পরিশেষে, সকল প্রসংশা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্যে। আমাদের নেতা মুহাম্মদ সা. এর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তার পরিবার ও সাহাবাদের উপর। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

"আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করি না"
নামক লেকচার থেকে সংগৃহীত

# বেটা! শপথ কর–

## “জিহাদের রাস্তা কখনও ছাড়বে না”

আমি জানি– শায়খ উসামা রহ. এর সন্তানরা তাঁর ব্যাক্তিত্বের সাথে সব ক্ষেত্রেই সম্পর্ক ও মিল রাখে। খুব কাছ থেকেই আমি তা দেখেছি– শায়খের পাশে তাঁর সন্তানরা এমনভাবে ঘিরে থাকত, যেভাবে সিংহকে ঘিরে থাকে সিংহ শাবকরা। ইনশাআল্লাহ! এমন কিছু স্মৃতিকথা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। হৃদয়ের এ্যালবামে প্রিয় শায়খের অনেক স্মৃতিই তো চিত্রিত হয়ে আছে। আজ আলোচনা করব– শায়খ ও তাঁর সন্তানদের মাঝের স্মৃতিময় দুটি ঘটনা।

প্রথমটি ঘটেছিল জালালাবাদে। যখন মুনাফিকরা জালালাবাদ দখল শুরু করল। আর আমরা তোরাবোরা পাহাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। শায়খের সাথে ছিল তাঁর আদরের ছোট তিন সন্তান। তাদের একজন খালেদ রহ.। যিনি শায়খের সাথেই শাহাদাতের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন। আর তাদের মাঝে খালেদই ছিল তুলনামূলক বড়। আমরা ওখান থেকে বের হয়ে তোরাবোরায় মাগরিব পড়ার ইচ্ছে করলাম। আসর আর মাগরিবের মাঝামাঝি সময়; এক সাথী শায়খের বাচ্চাদের নিয়ে এলেন। তারা আপন পিতাকে সালাম করল। শায়খ ঐ ভাইকে কাজ দিলেন– প্রথমে বাচ্চাদেরকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার। তারপর যেন, তাদের নিজ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়। আমি দূর থেকে এ দৃশ্যই দেখছিলাম!– একজন পিতা নিজের ছোট তিন সন্তানকে আল-বিদা বলছে! তাঁর জানা নেই– পুনরায় কবে আবার সাক্ষাৎ হবে তাদের সাথে! এই দুনিয়ায় কি সাক্ষাৎ হবে? আর না জানা আছে– এ কি প্রথম বিদায়; না শেষ বিদায়? আমি শায়খকে বিদায় দিতে দেখেছি। দেখেছি– সালামের পর তিনি তাঁদের বুঝাচ্ছেন– তোমরা এই চাচ্চুর সাথে যাও; তিনি তোমাদেরকে ঘরে পৌঁছে দিবেন। বড় ছেলেটির চোখে অশ্রু ঝরঝর করছিল। শায়খ নিজেও ছিলেন আবেগে আপ্লুত। শায়খের ছোট ছেলে বলল– “বাবা আমি কাবুলে ব্যাগ ফেলে এসেছি। আমি ব্যাগ কোথায়

পাব?” তাঁকে কে বুঝাবে?– কাবুল তখন শত্রুদের দখলে। শায়খ বললেন– “কোন সমস্যা নেই বাবা! তোমার চাচ্চু ব্যাগ নিয়ে দিবেন।” তারপর তাঁরা আলাদা হয়ে গেল। খুবই করুণ ছিল সেই দৃশ্য। ছেলে আর পিতা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কেউ জানে না– কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে সাক্ষাৎ হবে?

এমন আরেকটি ঘটনা। যার ফলে আমার অন্তরে তাঁর ভালবাসা গেঁথে গেছে। এটি ঐ সময়ের কথা; যখন আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তন হচ্ছিলাম। তাঁর কোন এক সন্তান আমাদের সাথে ছিল। আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে রাতের আঁধারে গাড়িতে আরোহন করলাম। এক জায়গায় গাড়ি থামল। সেখানে শায়খের সন্তানকে তাঁর রাহবারের সাথে নিচে নামানো হল। তাঁরা ও আমরা ভিন্ন যায়গায় যাচ্ছি। তাকে বিদায় দেয়ার জন্য শায়খ নিচে নামলেন। কেউ জানে না দ্বিতীয় বার দেখা হবে কিনা? আমরা দেখছিলাম– এই মূহুর্তে তিনি তাঁর সন্তানদের কি বলেন? তিনি বলছিলেন– বেটা! শপথ কর– “জিহাদের রাস্তা কখনও ছাড়বে না।” এই মূহুর্তটি আমি কখনও ভুলব না। আল্লাহর তাওফিক দিলে পুনরায় শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. এর জীবনীর আলোচনা করব।

**শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ-এর**
**আইয়্যামুন মাআল ইমাম হতে সংগৃহীত**

# লূত্ব আ. এর সম্প্রদায় ও বর্তমান জাহিলিয়্যাত

উস্তায আহমাদ নাবীল হাফিজাহুল্লাহ

**● লূত্ব আ. এর সম্প্রদায়-**

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ

"আমি লূত্বকেও পাঠিয়েছিলাম; সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমরা এমন কুকর্ম করছ; যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর।" -সূরা আরাফ: ৮০, ৮১

এ সম্প্রদায়ের মূল অপরাধ ছিল দু'টি।

এক. তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। দুই. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া।

'সমকামিতা' এমন এক জঘন্য অপরাধ; যে অপরাধে এ সম্প্রদায়ের পূর্বে বিশ্ব জগতের কেউ লিপ্ত হয় নি। যার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে – "তোমরা এমন কুকর্ম করছ; যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি।"

লূত্ব আ. তাঁর সম্প্রদায়কে এ হীন পাপাচার পরিত্যাগ করতে বললেন। তারা তাঁর আহ্বানে কোন সাড়া দেয় নি। তাঁর নিষেধের প্রতি কোন পরওয়া করে নি। মাত্রাতীত সীমালঙ্ঘনের কারণে তারা কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হল। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন। কি ছিল সেই শাস্তি?

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

"অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হল; তখন ভূখন্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম। এবং ওর ওপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম; যা ছিল একাধারে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল তোমার প্রভূর ভান্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।" -সূরা হূদ: ৮২-৮৩

কতই না ভয়ানক ছিল সেই শাস্তি! পুরো সম্প্রদায়কে জমিন সহ উল্টিয়ে দেয়া হল; তার ওপর একাধারে ঝামা পাথর বর্ষণ। অপরাধ– তাওহীদের প্রতি অবিশ্বাস; আর চরম পাপাচার সমকামিতায় লিপ্ততা।

**● বর্তমান জাহিলিয়্যাত-**

আমরা এক নব্য জাহিলিয়্যাতের মধ্য দিয়ে সময় পার করছি। এটা এমন এক জাহিলিয়্যাহ; ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্তনেই। পূর্বের উম্মতদের অনেক জাহিলী সমাজকে আল্লাহ তাআলা নিঃশেষ করে দিয়েছেন। আর ঐ সব জাহিলিয়্যাতের সমন্বয়েই সৃষ্ট আমাদের এই অত্যাধুনিক (!) সমাজ!

এই জাহিলী সমাজের একটা অপকর্ম নিয়ে আলোচনা করছি–

লূত্ব আ. এর সম্প্রাদায় ছিল এক ধরনের জাহিলিয়্যাতের মধ্যে। নব আবিষ্কৃত অপকর্ম সমকামিতার মধ্যেই তারা লিপ্ত ছিল। আচ্ছা! বর্তমান সমাজে কি এই অপকর্মটি বিদ্যমান নেই?! হ্যাঁ আছে।

তবে নব্য জাহিলিয়্যাত এই অপকর্মের কিছু আধুনিকায়ন করেছে। তাদের সমকামিতা ছিল শুধু পুরুষে-পুরুষে। কিন্তু এই নব্য জাহিলিয়্যাত এটাকে মেয়ে-মেয়ে গণ্ডিতে উন্নতি (!) করেছে। তাদের মাঝে সমকামিতা ছিল, কিন্তু সমকামীরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে; এমন কোন দৃষ্টান্তনেই। কিন্তু এই জাহিলিয়্যাতের মধ্যে পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী বিবাহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এই হচ্ছে আধুনিক জাহিলিয়্যাত।

**● তবে প্রশ্ন জাগে-**

সীমালঙ্ঘনের এত জঘন্য পর্যায়ে পোঁছার পরও কেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করছেন না!? কেন তাদেরকে তল-উপর করে দিচ্ছেন না!? কেনই বা তাদের উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করছেন না!? অথচ, এরা তাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত।

এর জবাব আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন–

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন।" -সূরা তাওবা:১৪

সুতরাং নব্য জাহিলরা আল্লাহ তাআলার শাস্তির পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে আছে। পূর্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা যে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস করেছেন; সেগুলোর এমন কোন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে এদের বিচারণ ঘটে নি। কিন্তু ঐ সব সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করেছেন তাঁর ফিরিশতাদের মাধ্যমে, আর এই আধুনিক জাহিলিয়্যাতকে ধ্বংসের দায়িত্ব দিয়েছেন আমাদের কাঁধে।

তাই আল্লাহ তাআলার বান্দারা যদি এই সমস্ত সমকামীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; তাহলে আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন। সমকামীরা কোনভাবেই আল্লাহ তাআলার বান্দাদের সামনে টিকতে পারবে না। কেননা, তারা তো শাস্তির উপযুক্ত হয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

"আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" -সূরা রুম: ৪৭

# ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্তঃ কোন পথে কওমী সন্তানেরা?

শাইখ তামিম আল-আদনানী হাফিজাহুল্লাহ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” - আছ ছফ: ৮

যুগে যুগে কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের আলোকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে, পদদলিত করতে চেয়েছে তাওহী-দের দীপ্তময় ঝান্ডাকে। তারা নানা পদ্ধতিতে চেষ্টা চালিয়েছে –ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে। মুসলিমদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতেই চলছে তাদের সব অভিনব ষড়যন্ত্র। নিত্যনতুন উপায়ে তারা ছক একেঁ যাচ্ছে মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখতে।

হাজার হাজার বছর ধরেই অব্যাহত রয়েছে কাফেরদের ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চতুর্মুখী সব হীন প্রচেষ্টা। এই উপমহাদেশে গজে ওঠা ক্বাদিয়ানি ফিতনাও তাদেরই অপচেষ্টার অংশ। মুসলিমদের ঈমান নষ্ট করার জন্য, তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত করার জন্য কুচক্রী ব্রিটিশ কাফেররা সক্রিয়ভাবে উত্থান ঘটিয়েছিল ক্বাদিয়ানি নামক এই নিকৃষ্ট কীটদের। আজও এই ফিরিঙ্গি কাফেররাই ক্বাদিয়ানি কীটগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে।

কিন্তু যখন মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহ করার জন্য কাফেররা মির্যা গোলামকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল; ঠিক তখনই উম্মাহকে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরি রহ. এর মত সিংহ পুরুষগণ। তারা ক্ষমতাসীনদের ভয় না করে, ভয় করেছিলেন একমাত্র আল্লাহকে। তারা সৃষ্টির ভয়কে তুচ্ছ করেছিলেন; শাসকদের রক্তচক্ষুর পরওয়া না করে সত্যকে প্রকাশিত করেছিলেন। আর সত্যের পক্ষে তাদের এই দৃঢ় অবস্থান; ত্যাগ আর কুরবানীর কারণেই উম্মাহ আজও তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে। তাদের এই মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্বাদিয়ানিদের ফিতনা থেকে উম্মাহকে রক্ষা করেছিলেন।

তবে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কাফেররা থেমে যায় নি। মুসলিম উম্মাহকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ থেকে, সাহাবা রাযি. এর অবস্থান থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে আজও তারা তাদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র আর কুপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এই তো আজ থেকে দশ বছর আগেও এই দেশের মাটিতে বসেই পশ্চিমা কাফেরদের আজ্ঞাবহ এনজিওগুলো গবেষণা করছিল– কিভাবে বাংলাদেশ থেকে কওমী মাদ্রাসাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়? কিভাবে দেশের সব ইসলামি বিদ্যাপীঠ বন্ধ করে দিয়ে ঈমান বিধ্বংসী সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায়? তারা এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গোলটেবিল আলোচনা করেছিল, গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিল। তারা চেয়েছিল এই যমিন থেকে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও নিশানাকে মুছে দিবে। আল্লাহর ইচ্ছায় বিপুল অর্থায়ন এবং প্রশাসনিক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের এই হীন প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে নি।

পরবর্তীতে তারা তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল পরিবর্তন করে। তারা বুঝতে পারে– এত সহজেই মুসলিমদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। তাই তাদের মাথায় আসে এক নতুন পরিকল্পনা। এবার তাদের টার্গেট– খোদ ইসলামকেই বদলে ফেলার। ইসলামের যে বিষয়গুলো তাদের অপছন্দ; সেগুলো বাদ দিয়ে তাদের পছন্দের এক নতুন ধর্ম চালু করার। তা হবে এমন এক ধর্ম; যা নামে ইসলামের মতোই হবে। বাহির থেকে যাকে দেখে ইসলামই মনে হবে; কিন্তু আসলে তা কুফর ছাড়া আর কিছুই নয়। কাফেররা তাদের তৈরি করা এই নতুন ধর্মের নাম দেয়– মডারেট ইসলাম, সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম।

এটা হল তাদের তৈরি করা এমন এক ইসলাম– যা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করাকে আবশ্যক মনে করে না; কিন্তু গণতন্ত্রকে আবশ্যক মনে করে। এটা এমন এক ইসলাম– যা ইসলামী রাষ্ট্র চায় না; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চায়। এটা এমন এক ইসলাম– যা আল্লাহর শরীয়তের আনুগত্য করাকে প্রয়োজন মনে করে না; কিন্তু কাফেরদের মনগড়া আইনের আনুগত্যকে ফরয মনে করে। এটা এমন

এক ইসলাম– যা নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য কিছু করার শিক্ষা দেয় না; কিন্তু সমকামীদের সমর্থনে মানববন্ধনের শিক্ষা দেয়। এটা এমন এক ইসলাম– যা হিজাব-নিকাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে; আর নারী অধিকারের নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় উৎসাহ দেয়। আর এটা হল এমন এক ইসলাম– যা কাফেরদের রাহে যুদ্ধ করাকে পুণ্যের কাজ মনে করে; আর আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন দেওয়াকে জঙ্গিবাদ বলে। মোট কথা এটা হল এমন এক আদর্শ; যা মুসলিমদের কাফেরদের চোখ দিয়ে কুরআন পড়তে শেখায়।

আর তারা এই নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে। তারা এটাও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে– যদি টাই-স্যুট পরিহিত কোন ফিরিঙ্গি বাংলাদেশে এসে এ আদর্শ প্রচার শুরু করে; তাহলে কখনোই সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করবে না। এ জন্যই তারা সিদ্ধান্ত নেয়– এ দেশের কওমী সন্তানদের মাধ্যমে; অর্থাৎ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বের হওয়া ইমাম-খতিবদের মাধ্যমেই তাদের এই নব্য ইসলাম প্রচার করবে।

এরই লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন এনজিওর পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থী এবং জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ইমাম-খতিবদের নিজেদের কুফরি আদর্শে দিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী হাতে নেয়।

আর এ ধরনের একটি এনজিও হল মুভ ফাউন্ডেশন। জার্মান দূতাবাসের অর্থায়নে পরিচালিত মুভ ফাউন্ডেশন নামের এই এনজিওটি কথিত 'উগ্রপন্থা' বিরোধী এক কর্মশালার আয়োজন করে। যেখানে অংশ নেয় বাংলাদেশের স্বনামধন্য বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসার ছাত্র। এই কর্মশালায় গিয়ে আমাদের কওমী সন্তানরা কি করছে? তারা লজ্জা-শরমের মাথা খুইয়ে গ্রুপ ওয়ার্কের নামে মেয়েদের গা ঘেষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে; সহনশীলতার নামে নারীর হাত ধরে নাচানাচি করছে। দেয়ালে দেয়ালে ক্রুশ, ক্রুশবিদ্ধ যিশু, পাদ্রী-পুরোহিতের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে 'শুদ্ধ' ধর্মীয় জ্ঞান শেখার শপথ নিচ্ছে। নারী-পুরুষ পরস্পরের হাত মিলিয়ে 'জঙ্গিবাদ নিপাত যাক' শ্লোগানে মেতে ওঠেছে।

আজ ক্রুসেডার রাষ্ট্র জার্মানির অর্থায়নে পরিচালিত মুভ ফাউন্ডেশন নামের এনজিও আমাদের কৃওমী পড়ুয়াদের 'সহনশীল ও আধুনিক' বানাচ্ছে। তাদের মডারেট ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছে। সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম শেখাচ্ছে। অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা গেলাচ্ছে। আর আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের উত্তরসুরি হওয়ার দাবিদারেরা তাদের কাছে 'শুদ্ধ' ধর্মীয় জ্ঞান শেখার শপথ নিচ্ছে। উপরে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে কতটুকু নিচে নেমে যাচ্ছেন আমাদের ভবিষ্যতের আকাবির আল্লামারা? মুভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় অংশ-গ্রহণকারী কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের আমরা প্রশ্ন করতে চাই–

শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শ কি বিশুদ্ধ ছিল না? বালাকোটের বীর শহীদদের ইসলাম কি শুদ্ধ ছিল না? তিতুমীরের বাশের কেল্লা কি সঠিক ধর্মীয় ভিতের উপর গড়া ছিল না? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন ফতোয়া প্রদানকারী শাহ আব্দুল আযিয আর রশিদ আহমদ গাঙ্গোহিদের ধর্মীয় জ্ঞান কি বিশুদ্ধ ছিল না? কাসেম নানুতুবী রহ. ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরিদের ধর্মীয় জ্ঞান কি বিশুদ্ধ ছিল না? হক্বের প্রশ্নে আপোষহীন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ধর্মীয় জ্ঞান কি শুদ্ধ ছিল না? তাঁদের আদর্শ পরিহার করে, তাঁদের ইলমী ওয়ারিশ হওয়ার পথ ছেড়ে দিয়ে; কেন ইসলামকে বদলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুভ ফাউন্ডেশনে গিয়ে শুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার শপথ নেওয়া হচ্ছে?

দখলদারিত্বের বিরোধিতার জন্য, আগ্রাসনের মুখে দ্বীন ও উম্মাহর হেফাজতের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিভাবে সেই দেওবন্দের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হয়ে, যারা উম্মাহ ও দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত; তাদের কাছে গিয়ে সহনশীলতা শিখছেন? তাদের শেখানো এ সহনশীলতা কি নবী মুহাম্মাদ এর দেখানো মধ্যম পন্থা? নাকি কুফর আর শিরকের প্রতি সহনশীলতা? এটা কি কাফেরদের গোলামির প্রতি সহনশীলতা নয়? মুসলিমদের উপর চালানো হত্যাযজ্ঞকে বৈধতা দেওয়া নয়? যেখানে দ্বীনের স্পর্শ পেয়ে জাহিলিয়্যাতের অন্ধকারে ডুবে থাকা যুবকেরা নারীর ফিতনা থেকে ফিরে আসছে; সেখানে কিভাবে একজন তালিবুল ইলম মুর্খ জাহেলের মত পর্দাহীন অর্ধ উলঙ্গ নারীর গা ঘেষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকতে পারে? কিভাবে তাদের হাত ধরে ঘুরপাক খায়?

কাফেররা যখন মির্যা গোলামের মাধ্যমে মুসলিমদের গোমরাহ করার ষড়যন্ত্র করেছিল; তখন আকাবিরে দেওবন্দ এই ফিতনার বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলেন। তাহলে আজ কেন আপনাদের মত মাদ্রাসার ছাত্ররা ইসলামকে বদলে দেওয়ার এ যুদ্ধে কাফেরদের আদর্শিক সৈনিকে পরিণত হচ্ছেন? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

এখনও সময় আছে; এই অধঃপতনের পথ থেকে ফিরে আসুন! এই গোলামির পথ পরিহার করুন! সামান্য স্বীকৃতি আর দুনিয়া অর্জনের লোভে, কাফিরদের বেঁধে দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী আধুনিক হওয়ার মোহে, জাতে ওঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে; নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করবেন না। ক্ষমতাসী-নদের ভয়ে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না। যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত; তাদের সহযোদ্ধায় পরিণত হবেন না। দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে বরবাদি ছাড়া এই পথে আর কিছুই নেই। সামান্য বিনিময়ে নিজেদের ইলম ও ঈমান বিকিয়ে দেবেন না। এখনও সময় আছে; এই পথ থেকে ফিরে আসুন!

আপনারা ইসলামের বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন ও আক্রমণের মোকাবেলায় আকাবিরে দেওবন্দের রেখে যাওয়া উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন! প্রমাণ করুন! আপনারা আকাবিরে দেওবন্দের উত্তরসুরি। দেওবন্দের সুরতে মির্যা গোলামের উত্তরসুরী নন।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহ সকল দীনের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" - আছ ছফ: ৯

আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে হেফাজত করবেন। অবশ্যই অবশ্যই এই দ্বীনকে গালেব করবেন। এটা তাঁর ওয়াদা। আর নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সৌভাগ্যবান তারা; যারা দ্বীন-বিজয়ী এ কাফেলায় অবিরাম সচেষ্ট। দুর্ভোগ তাদের; যারা এই আলোকিত কাফেলার বিরোধী। আর এ বিজয়ী কাফেলার অংশ হতে হলে, আমাদের তো সেই যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে। স্রোতের বিপরীতে সত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে। হক্বের ব্যাপারে আপোষহীন হতে হবে। কাফেরদের আদর্শ ফেরি করে নিছক নিজেদের হক্কানী দাবি করার মাধ্যমে এই বরকতময় কাফেলায় শামিল হওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদের সেই দ্বীন বিজয়ী কাফেলায় অংশগ্রহণের তাওফীক দান করুন!

نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد

সম্প্রতি এ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্থাপন করা হয়েছে একটি অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি। গ্রীক মূর্তি পূজারীদের বিশ্বাস–'দেবী থেমিস' এর এ মূর্তিটি হল ন্যায়-পরায়ণতার দেবী।

এ মূর্তিটি নিয়ে আমাদের সামাজে দুই ধরনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। একদিকে, সুশীল-সেক্যুলার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দালাল শাহবাগী গোষ্ঠী। তাদের দাবী– এ মূর্তিটি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। তারা আরও বলছে– এটি কোন মূর্তি নয়; বরং এটি হল ভাস্কর্য। আর যারা এই মূর্তির বিরোধিতা করে; তারা হল মধ্যযুগীয়, বর্বর ও সাম্প্রদায়িক। তারা মুক্তিযুদ্ধ ও হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিরোধী শক্তি।

অপরদিকে, হেফাজতে ইসলাম সহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত বাংলাদেশের আলেম সমাজ সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্থাপিত এই মূর্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত। মূর্তি অপসারণের জন্য বিবৃতি প্রকাশ, স্মারক লিপি পেশ এবং কঠিন আন্দোলনের হুমকি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছেন। আমরা এই উভয় পক্ষের কাছেই কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

প্রথমে সুশীল- সেক্যুলার চেতনা ব্যবসায়ীদের কাছে কিছু প্রশ্ন করছি।

**প্রথম প্রশ্ন:** তোমরা বলছ– ভাস্কর্য আর মূর্তি দু'টি আলাদা জিনিস। ভাস্কর্য আর মূর্তি যে দু'টা আলাদা জিনিস; এই তথ্য তোমরা কোন উৎস থেকে পেয়েছ? আর কিভাবেই বা তোমরা এটা মনে করলে– মূর্তির সংজ্ঞা মুসলমানরা ইসলাম থেকে না নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে নিবে?

চেতনা ব্যবসায়ীদের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন– কিভাবে গ্রীক দেবীর মূর্তি বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়? নাকি বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতেই তোমরা মূর্তি পূজাকে বোঝাও?

চেতনা ব্যবসায়ীদের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন– কিভাবে গ্রীক দেবীর মূর্তি বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়? নাকি বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতেই তোমরা মূর্তি পূজাকে বোঝাও?

আর চৌদ্দশত বছর আগে নাযিলকৃত ইসলামের বিধান পালন করার কারণে যদি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তোমরা মধ্যযুগীয় বলে বেড়াও। তাহলে, হাজার বছর আগে যেই মূর্তির উপাসনা করা হত; সেই গ্রিক মূর্তির প্রতি তোমাদের ভালোবাসার কারণে, তোমাদের জাহেলিযুগীয় বললে খুব বেশি বলা হবে কি?

যদি গ্রিক মুশরিকদের থেমিস দেবীর মূর্তিকে ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের সামনে স্থাপন করতে তোমাদের এত আগ্রহ হয়; তাহলে সম্পূর্ণ মানব রচিত সংবিধানে বিসমিল্লাহ আর নামেমাত্র রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকলে তোমাদের এত আপত্তি কেন? তোমাদের কথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার ফিল্টারে ইসলাম ছাড়া আর কিছুই কি আটকায় না?

আর হেফাজতে ইসলামসহ সরকারের কাছে দাবী আদায়ে আন্দোলনরত সম্মানিত উলামায়ে কেরামের প্রতি আমাদের প্রশ্ন–

যেখানে বাংলাদেশের নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সব আদালতেই মানব রচিত কুফরী সংবিধান দিয়ে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। যেখানে সংবিধানে পরিস্কার ভাবে বলা আছে- "সংবিধানই হল এই দেশের সর্বোচ্চ আইন, এর সাথে সাংঘর্ষিক বাকি সব আইন বাতিল।" যেখানে এই সুপ্রিম কোর্ট থেকে অহরহ ইসলাম ও শরিয়াহ বিরোধী আইন পাশ করা হয়। সেখানে এই সুপ্রিম কোর্ট নামক মন্দিরকে ফেলে মন্দিরের দরজার সামনের মূর্তিকে নিয়েই শুধু আপনারা কথা বলছেন?

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে মাজীদে এরশাদ করেছেন, إن الحكم إلا لله "বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।"

যে কোর্টে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে নিজেদের রচিত বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা হয়। আল্লাহর আইনকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। সেই কোর্টই যদি বহাল থাকে, স্বয়ং খোদার আসনে সমাসীন থাকে; তাহলে তার সামনে মূর্তি থাকা বা না থাকা নিয়ে আন্দোলন করে কি লাভ? মূর্তির আখড়া ঠিক থাকুক, শুধু এই একটি মূর্তিকে অপসারণ করলেই চলবে; এটাই কি তাওহীদী চেতনার দাবী। মূর্তি কি কেবল সুপ্রিম কোর্টের সামনেই স্থাপিত হয়েছে? প্রকাশ্যে আর কোথাও কি মূর্তি স্থাপিত নেই।

**হে উলামায়ে কেরামগণ!**

যে সুপ্রিম কোর্ট স্বয়ং একটি তাগুত, যেই সুপ্রিম কোর্টই একটি মূর্তি; সেই সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপারে নিরব থেকে কেন শুধু তার সামনের মূর্তিটি নিয়েই কথা বলছেন? হে

**হে উলামায়ে কেরামগণ!**

বাংলাদেশের মানুষ এখনো বোঝে না যে, এ সুপ্রিম কোর্টে আল্লাহর বিধান বিরোধী আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করা হয়, কুরআন বিরোধী আইন দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করা হয়। মানব রচিত কুফরি সংবিধান বাস্তবায়নের মূল আখড়াই হল দেশের সর্বোচ্চ আদালতখ্যাত এই সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এই মহা সত্য বিষয়টা আপনারা তো জানেন।

এই সত্য বিষয়টা উম্মতকে জানানো কি আপনাদের দায়িত্ব নয়? নবীর ওয়ারিশ হিসেবে উম্মতকে এই ভয়াবহ শিরক ও কুফর থেকে সতর্ক করা কি আপনাদের ওপর আবশ্যকীয় নয়? তাহলে কেন আপনারা এই দায়িত্ব পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র গ্রিক দেবীর মূর্তি অপসারণের জন্য মূর্তি পূজারীদের কাছে কাকুতি-মি-নতি করছেন?

**হে উলামায়ে কেরামগণ!**

মূর্তির পক্ষে আমরা কথা বলছি না। মূর্তির পক্ষে আমাদের অবস্থানও নয়। আমরা শুধুমাত্র আপনাদের এ সত্যকে উপলব্ধি করার আহ্বান করছি – এই তাগুত শাসক গোষ্ঠীর কাছে আবেদন করে কী লাভ হয় আমাদের?

ইতিপূর্বেও তো আপনারা তাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। আপনাদের ন্যূনতম দাবীও কি আদায় করতে পেরেছিলেন? সেই দিন তো অসংখ্য নিরস্ত্র অপ্রস্তুত মুসলমানেরই রক্ত ঝরেছিল। অনেক ভাই শহীদ হয়েছিল। কিন্তু আপনারা আপনাদের কোন দাবীই আদায় করতে পারেন নি।

তাহলে আবারো কেন এই মুরতাদ শাসক ও মূর্তির রক্ষকদের কাছে মূর্তি অপসারণের দাবী? এ যেন শিয়ালের কাছেই মুরগি রক্ষার আবেদন!

এই মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী, গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমকে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা প্রতিহত না করে শুধুমাত্র একটি মূর্তি সরানোর আবেদন করা বুজদিলি ছাড়া আর কিছুই নয়।

**হে উম্মাহর রাহবার উলামায়ে কেরাম!** কেন আপনারা এই উম্মাহকে লাঞ্ছনা আর অপদস্থতার পথে নিয়ে যাচ্ছেন? কেন নিজেদের দায়িত্ব পালন থেকে বারবার পিছিয়ে যাচ্ছেন? কেন সত্যকে জনগণের সামনে স্পষ্ট করছেন না? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেন নি?

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

‘অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন! যা আপনাকে আদেশ করা হয়। এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।’ - সূরা হিজর: ৯৪

এই উম্মাহ তো ইজ্জতের জিন্দেগী অথবা ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এই উম্মাহকে সম্মান আর মর্যাদাময় জিন্দেগির পথ দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহর মনোনীত এই উম্মাহকে গাইরুল্লাহ এর সামনে মাথা নত থেকে রক্ষা করুন!

বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করুন! আর উম্মাহর সামনে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুন– “আল্লাহর কালেমাই সবকিছুর উর্ধ্বে।” আর বাস্তবেই যদি মূর্তির অভিশাপ থেকে এই উম্মাহকে রক্ষা করতে চান; তাহলে আল্লাহর মনোনীত বিধান জিহাদে বের হয়ে পড়ুন!

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক; যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়। এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।’ - সূরা আনফাল: ৩৯

আসমান ও যমিনের মালিক বলেছেন,

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।’ - সূরা হাদীদ: ২৫

**হে বাংলার উলামায়ে কেরামগণ!** আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ অনুসরণ করুন! কেননা, তিনি পবিত্র কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ করে দেখিয়ে গেছেন– কিভাবে মূর্তি অপসারণ করতে হয়! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বাতিল মা’বুদসমূহের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন! আমীন!

জাফর, নাকি মীর জাফর!

# জাফর, নাকি মীর জাফর!

মুসাল্লাহ কাতিব

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় জ্ঞানপাপী, মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট 'চুল্কানিষ্ট' লেখক ও চেতনার ফেরিওয়ালা, ইসলাম ও মুসলিম জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানসিকতা ধারণকারী ব্যক্তি হচ্ছেন মিস্টার জাফর ইকবাল। যার লেখা থেকে শুধু পচা মগজের তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়। ইসলাম নিয়ে তার এলার্জি অনেক পুরাতন। তিনি তার চুলকানি মার্কা লেখা প্রসব করে একের পর এক ব্যঙ্গাত্মক আঘাত ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে করে যাচ্ছেন। তার এই সমস্ত বর্জ্য সম লেখা দ্বারা তার পশ্চিমা প্রভু ও এদেশীয় নাস্তিক ভাব শিষ্যরা বেজায় খুশি। এ রকম প্রজন্ম বিধ্বংসী লেখাতে তিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে ইসলামি পোশাক, দাড়ি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধার্মিক ব্যক্তি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে হেয় করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। দেশের তরুণ প্রজন্মকে সেক্যুলার ও নাস্তিক্যবাদ এর চেতনায় কনভার্ট করতে তিনি শিশুতোষ উপন্যাস রচনার মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি 'একুশে বইমেলা ২০১৭'তে তার সবচেয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী বই "ভূতের বাচ্চা সুলাইমান" প্রকাশ করে মুমিনদের অন্তরে আঘাত দিয়েছেন। তার লেখালেখির ধরন একমাত্র 'কাব বিন আশরাফ' নামক ইহুদির লিখার সাথে তুলনা করা যায়। যে ইসলাম ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কষ্ট দিত। সেই 'কাব বিন আশরাফ'কে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল; জমানার এই 'কাব বিন আশরাফ'কেও ঠিক একই পদ্ধতিতে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার বিকল্প নেই।

এই নাস্তিক গুরু অত্যন্ত কপট ও ধূর্ত। সে প্রকাশ্যে তার নাস্তিকতা ও ইসলাম বিদ্বেষী আকিদা স্বীকার করে না। কিন্তু, সে তার সাহিত্যে পর্দা, দাড়ি সহ ইসলামি বিভিন্ন নিদর্শন-সমূহকে কটাক্ষ ও বিদ্রুপসূচক বাক্য উপস্থাপন করে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে সূক্ষ্ম কৌশলে ইসলাম বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই নাস্তিক গুরুর শিক্ষা বা দর্শন কতটা ভয়ংকর ও নিকৃষ্ট; তা তার শাহবাগী শিষ্য নাস্তিক-শাতিমদের উগ্র নোংরা লেখা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও এই নাস্তিকরা নিজেদের সুশীল ও মুক্তমনা দাবি করে; কিন্তু, তাদের নিকৃষ্ট রুচি ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের ধরন এতই নিচু যে, কোন ভদ্র সমাজের মানুষের পক্ষে তাদের লেখা পড়া সম্ভবই হবে না। এই জন্য একজন বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে, "জাফর স্যার শুধু নাস্তিক নয়, সে নাস্তিক তৈরির কারখানা।"

সে বা তার অনুসারীরা মনে করে যে, ইসলামের মৌলিক চিন্তা-চেতনা লালন করা বা প্রচার করা এটা ধর্মান্ধতা। শরিয়াহ এর বিধান– এটা অন্ধকার যুগের কথা। আর ইসলামের শাশ্বত বিধানাবলীর বিরুদ্ধে তাদের চরম কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বা লেখালেখি হল মুক্তমনা বা মুক্তচিন্তার চর্চা। তাদের কলমের কালি থেকে কেবল ড্রেনের কালো দুর্গন্ধময় ময়লা পানির গন্ধই আসে; যা একমাত্র নর্দমার কীটরাই গোগ্রাসে গিলে থাকে।

এই সমস্ত ভদ্রবেশী ভণ্ড নাস্তিকরা আসল কাফের থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ, এরা মুসলিম সমাজে বসবাস করে ইসলামের দুশমনদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। তাদের মা-বাবারা কত সুন্দর করে নামের সাথে মুহাম্মদ যুক্ত করেছিল; কিন্তু তারা কি জানত?– তাদের কুলাঙ্গার সন্তানরা একসময় 'কাব বিন আশরাফের' মত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আনীত দ্বীনের বড় দুশমন হয়ে দাঁড়াবে। তারা তাদের মা-বাবার স্বপ্নের সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে এবং ইসলামের সাথে গাদ্দারি বা 'মীর জাফরি' করে হিন্দুত্যবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ফেরি করে বেড়াচ্ছে আর তাদের দূষিত সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে ছড়াচ্ছে।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল– উম্মাহর রাহবার আলেম সমাজ মাতৃভাষা বাংলা চর্চা না করায় বাংলাভাষা এখন একচেটিয়া হিন্দু ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের হাতে অপব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি জাতীয় সিলেবাস নির্ধারণ ও রচনার ক্ষেত্রে এই হিন্দু ও নাস্তিকদের দায়িত্ব দেয়া এই জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় চক্রান্ত। তাদের আক্রমণাত্মক লেখালেখির বিরুদ্ধে আমাদের ইসলামপন্থীদের লেখা সাধারণত; সাহিত্যের মান তো দূরের কথা বানান শুদ্ধির পর্যায়ে পড়াটাই অপ্রতুল। তবে বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক দ্বীনি ভাইদের লেখালেখি ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করা আমাদের জন্য আশার প্রদীপ জ্বেলেছে।

তবে, বাস্তব কথা হল– এই ধরনের মাস্টারমাইন্ড নাস্তিকদের মোকাবেলা শুধু কলম দিয়ে করলেই যথেষ্ট নয়; বরং চাপাতির ভূমিকাই অধিক কার্যকর। আর এটাই আমরা সিরাত থেকে শিক্ষা লাভ করি– মুরতাদ, শাতিম ও 'মীর জাফর'দের উচিত পাওনা চাপাতি দিয়েই মিটাতে হয়। আল্লাহ কালেমার সূর্যকে আলোকিত করুন! আর সমস্ত চামচিকাদের জাহান্নামের অন্ধ গহ্বরে নিক্ষেপ করুন! আমীন!

# মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য্য হাসে

মুফতী হাসান আব্দুল বারী
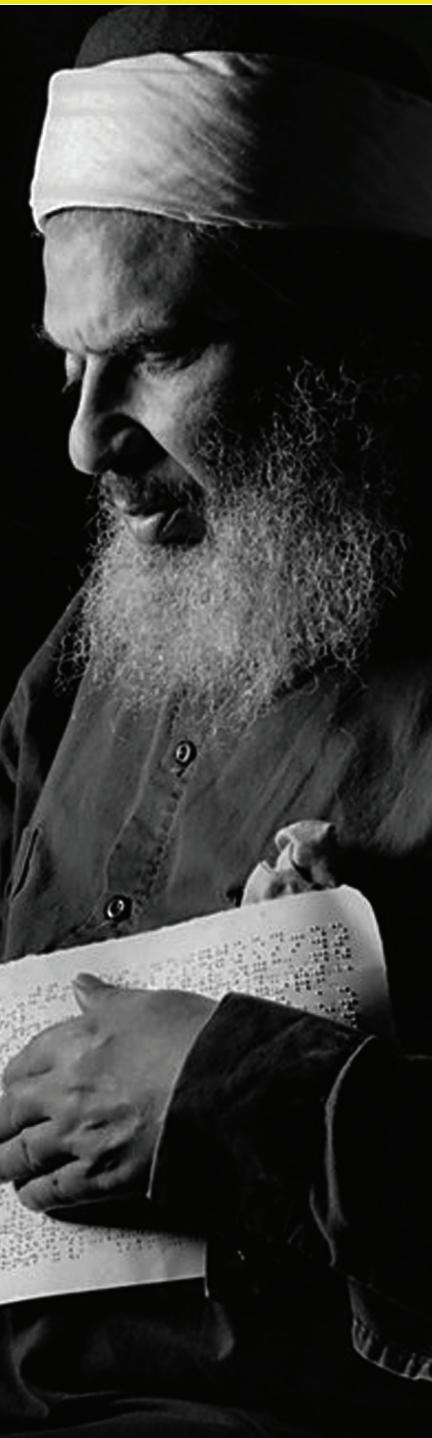
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক কিছুই ঘটে চলছে। বেদনার শোকবার্তা যেমন আমাদের মনে বিরহ উসকে দিয়েছে। তেমনি অভূতপূর্ব আনন্দবার্তায় গুমোট বাতাবরণে স্বস্তির হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে। কয়েকদিনের ব্যবধানে বিশ্বজিহাদের কজন গুণীমানুষকে আমরা হারিয়েছি।

১

**শায়খ উমর আব্দুর রহমান।** শায়খ আবুল খায়ের মিসরী। মোল্লা আব্দুস সালাম আখন্দ। প্রথম দুজনতো আকাশের সুরা্ইয়্যাতারকা। উম্মাহ কি জানে তারা কাদের হারালো?

শায়খ উমর আব্দুর রহমান ছিলেন যুগের ইবনে তাইমিয়াহ। ইলমসাগরের ডুবোরী। জিহাদের ময়দানের ইবনুল মুবারক। তাগুতের সামনে আহমদ বিন হাম্বলের মূর্তপ্রতীক। আমৃত্যু আপোষহীন এ মর্দেমুজাহিদ কারাগারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অথচ ছিলেন জন্মান্ধ।

**শায়খ আবুল খায়ের মিসরী।** আল কায়দার নায়েবে আমীর। বিশ্বজিহাদের এক অবিসংবাদিত নেতা। ছিলেন ক্লিন ইমেজের অধিকারী। যেখানে যেতেন সবাইকে আপন করে নিতেন। দলীয় চিন্তার উর্ধ্বে উঠে সব মহলের কাছে সমান প্রিয় ছিলেন।

**মোল্লা আব্দুস সালাম আখন্দ।** গজনী প্রদেশের তালেবান কমান্ডার। তারুণ্যের আদর্শ এ বীর তাগুতের যম হিসাবেই খ্যাত ছিলেন।

২

এবার বলি সুখের খবর। প্রথমেই আসি সিরিয়া প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে দ্বিমত করার অবকাশ আশা করি নেই যে, সিরিয়াকে কেন্দ্রকরেই বিশ্ব কাফের এখন দাবার গুটি চালাচালি করছে। কখনো লাইম লাইটে ন্যাটো, তো কখনো রাশিয়া-ইরান। মুসলিম দেশগুলোর অথর্ব তাগুত শাসকরা তো শুধু দাবার গুটির মতো এ কোর্ট ও কোর্ট মাথা ঠুকছে।

স্মর্তব্য, ইরানকে মুসলিম দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। এ দেশটিই মূলত মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ত্রাস সৃষ্টির পেছনে দায়ি। অন্য কোন পর্বে এদের নিয়ে লেখার ইচ্ছা আছে।

খুলে বলছি। আলেপ্পোর কথাই ধরা যাক। যখন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিভীষণ চলছিল,তখন অনেকটা অযাচিতভাবেই মঞ্চে আগমন ঘটে তুরস্কের। 'সেভ আলেপ্পোর নামে' পরিকল্পিতভাবে তুরস্ক-আমেরিকা বিদ্রোহীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। আইএস দমনের নামে তুরস্ক ফ্রি-সিরিয়ান আর্মিকে বাগিয়ে নেয়। আমি জানি অনেকে এরদোগানের ভূমিকাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে থাকবেন। তবে একটু অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে তাকালে দেখবেন; যতটুকু না তিনি সিরিয়ার মানুষের জন্য কেঁদেছেন–তারচেয়ে বেশি নিজের দেশের সীমান্ত সুরক্ষা ও অখণ্ডতা রক্ষার চিন্তায় বিভোর ছিলেন। সিরিয়ার স্বাধীন গণমাধ্যমসহ আন্তর্জাতিক একাধিক গণমাধ্যমে এ তথ্য উঠে এসেছে যে, রাশিয়া ও বাশারের সম্মিলিত শিয়া মিলিশিয়া বাহিনী যখন আলেপ্পোতে পৈশাচিক বর্বরতা চালাচ্ছিল; তখন একাধিক বৃহদ বিদ্রোহী গ্রুপ অঘোষিতভাবে যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের সাথে গোপন সন্ধির ভিত্তিতে ভেতরের তথ্য সরবরাহ করছিল। অন্যদিকে তুরস্কের বাহিনী আইএস দমনের উদ্দেশ্যে আল-বাব অভিযানে ব্যস্ত ছিল। তখন যদি তারা আলেপ্পো রক্ষায় বিদ্রোহী-দের সাহায্য করতো কিংবা, অন্তত নিজেরা বিদ্রোহীগ্রুপগুলোর মাঝে বিভক্তি না ছড়াতো–তাহলে বাশারের জন্য আলেপ্পো দখল সম্ভব হতো না। আলেপ্পোর দখল ছিল তাদের কাছে স্বপ্নের মতো। তাদের সমর কৌশল ছিল ত্রাস সৃষ্টি করে মুজাহিদদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করা।

পুতিন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, আলেপ্পোর ব্যাপারে এরদোগানের সাথে তার সমঝোতা হয়েছে। সমঝোতা যে কিসের বিনিময়ে হয়েছে তা এখন আরো স্পষ্ট হয়েছে। আইএসের ক্রমবর্ধমান হুমকি আর কুর্দিদের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতেই এরদোগান সিরিয়ার অভ্যন্তরে সেনা অভিযান পরিচালনার অনুমতি লাভের বিনিময়ে আলেপ্পো নিয়ে ঘৃণ্য গেম খেলেছেন। এখন আল-বাব, মানবিজ ও দের আজ-জোরের দখলকৃত এলাকাগুলো বাশারের হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন।

কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা থেমে থাকেন নি। ইদলিবে ফিরে গিয়ে নিজেদের সুসংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। এক্ষেত্রে জাবহাতু ফাতহিশ-শামের আমীর 'হাকীমুশ-শাম শায়খ জুলানী' অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। দফায় দফায় আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে 'হাইয়াতু তাহরিরাশ-শাম' নামে সংগঠিত হতে শুরু করেন মুজাহিদীনগণ। উম্মাহর স্বার্থে নিজে নেতৃত্বের শীর্ষ আসন সানন্দে ছেড়ে দেন। আহরার আশ-শামের প্রাক্তন আমীর 'শায়খ আবু জাবের' হন আমীর। জিহাদী গ্রুপগুলো ছাড়াও শামের আলেমগণ দলে দলে এসে যুক্ত হন 'হাইআতু তাহরি-রিশ-শামের সাথে। তবে, 'আহরার আশ-শামে'র গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতৃবৃন্দ ও কিছু ব্রিগেড হাইয়ার সাথে যুক্ত হলেও 'আহরার আশ শামে'র বড় অংশ এখনো পর্যন্ত আলাদাই রয়েছে। আমরা আশা করবো, শামের মাটিতে তাদের কুরবানী তাগুতরা কিনে নিতে সক্ষম হবে না। আহরার ঘরে ফিরবে। বাস্তবতা উপলব্ধি করে ছোটখাটো সমস্যা কিংবা ভুল বোঝাবুঝি নিরসন করে কাফেলায় যুক্ত হবে। যে সব কৌশল আলেপ্পোতে ব্যর্থ হয়েছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ইতোমধ্যে হিমসে এক অভাবনীয় ইস্তেশহাদি হামলায় বাশারের গোয়েন্দা বাহিনীর প্রথম সারির এক কমাণ্ডারসহ চল্লিশোর্ধ সেনা-কর্মকর্তা নিহত ও অর্ধশতাধিক গুরুতর আহত হয়েছে। শুধু সম্মুখ লড়াই কার্যকরী হবে না। তাই ফেদায়ী স্কোয়াড ও টার্গেট হামলার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দামেস্কের অভ্যন্তরে পুনরায় উম্মাহর শার্দুলরা মরণ-অভিযান পরিচালনা করে তাগুতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। অন্যদিকে উপকূলীয় শহর লাতাকিয়ায় চালানো হচ্ছে সংগঠিত অভিযান। অথচ দেখুন, আইএস রহস্যজনকভাবে পালমিরা পূণর্দখল করলেও গত দু সপ্তাহের ভেতর পালমিরা, আল-বাব, মানবিজসহ রাকার পল্লী এলাকাগুলো ছেড়ে ক্রমেই কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে মসুলের অনেক এলাকা থেকেও পিছু হটেছে। আর কয়েক লাখ সুন্নী মুসলিম সেখানে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আল্লাহ মুজাহিদীনদের সে এলাকাগুলো উদ্ধারের তওফিক দিন।

৩

নিবন্ধের রেশ টানতে হচ্ছে। তবে আরো কিছু সুসংবাদ দেয়ার ইচ্ছাটা দমন করতে পারছিনা!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের উপহার কিন্তু **ইয়েমেনের মুজাহিদরা** বেশ সুদৃশ্য গিফটহ্যাম্পারেই দিয়েছেন। বেটা চেয়েছিল মেরিন কমান্ডোদের দিয়ে একটা রুদ্ধশ্বাস অভিযান চালাতে! উল্টো নিজ বীর(!) সৈন্যদের লাশের কফিনই ভাগ্যে জুটলো!! দারুন হয়েছে না উপহারখানা !? এখানে বলে নিই, আল-কায়দার 'আরব পেনিনস্যুলা'র যে ক'জন শায়খ গত বছর শহীদ হোন -এর পেছনে আইএসের হুম্মাম হামিদ নামে এক কুলাঙ্গার সি আই এর সাথে গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদানে যুক্ত ছিল।

অন্যদিকে লিবিয়ায় চলছে বেনগাজীর সিংহদের পাল্টা অভিযান। বেচারা হাফতারের প্রভু মিসর ও আমিরাত একবারে হাপিয়ে উঠেছে! আর সাহারা ভূমির সৈনিকরা মালিতে একতাবদ্ধ হয়ে আল-কায়দার হাতে বায়আত দিয়েছে। ইতোমধ্যেই ফ্রান্স ও তাগুতবাহিনীর কোমর ভেঙ্গে দিতে একের পর এক হামলা করে যাচ্ছে। সবচেয়ে হৃদয় প্রশান্তকারী কথা হচ্ছে সোমালিয়ায় মুজাহিদীনরা রাজধানীর ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে।

শেষ করছি আফগানিস্তনের কথা দিয়ে। এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুরো আফগানিস্তানের ৭৫% এলাকা এখন 'ইমারাতে ইসলামিয়া'র সুশীতল ছায়ায় চলে এসেছে। এই তো কয়েকদিন আগে পাকিস্তান সরকার দুদিনের জন্য বর্ডার খুলে দিয়েছিল। ফলে ৫০ হাজার আফগান উদ্বাস্তু তালিবান নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে ফিরে গেছে। কেন গেছে? তালিবানরা যদি এদের ওপর নির্মমতাই চালাবে তো এরা যাচ্ছে কেন? বাপু, তোমাদের এসব মিথ্যের বাস্তবতা মানুষ বুঝতে শুরু করেছে। আশা করি মুসলিম উম্মাহ কাগুজে সুপার পাওয়ারদের চোখ রাঙানিকে তুড়ি মেরে এ মোবারক কাফেলায় শামিল হবে। মেঘ যতই গর্জন করুক তার ফাঁকেই কিন্তু সূর্য্য হাসে।

# আরাকানের পরিস্থিতি কি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে?

*-উমাইদ আল আইমান*

মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন লোক হয়তো খুব কমই পাওয়া যাবে; যাদের সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা নেই। অথচ তারা আরাকানের নির্যাতিত মাজলুম মুসলিমদের কান্নার আওয়াজ শোনে নি; কিংবা তাদের প্রবাহিত রক্তের স্রোত দেখে নি। হ্যাঁ! এমন লোকও অনেক রয়েছে; যারা চায়– আপন অঙ্গনের খবরাখবর ছাড়া ভিন্ন কোন সংবাদ যেন তাদের কানে না আসে; যা তাদের নিজ নিজ কাজে বিঘ্নতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বৌদ্ধ ন্যাড়া সন্ত্রাসীদের পাশবিকতা এতটাই চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, বিশ্বের চলমান পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ও মিডিয়া বিমুখ লোকেরা পর্যন্ত কিছু বলা কিংবা করা থেকে গাফেল থাকতে পারে নি।

আরাকানের মাজলুম মুসলিমদের ওপর বৌদ্ধ ন্যাড়া সন্ত্রাসীদের নৃশংসতা বন্ধের লক্ষ্যে পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিক্ষুব্ধ মুসলিম জনতা নিজ নিজ ক্ষোভ প্রকাশ করে দেখিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে তো কোথাও না কোথাও চলছিল মিটিং-মিছিল, মানববন্ধন, লংমার্চসহ সম্ভাব্য সব ধরণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন-কর্মসূচী; যাতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বৌদ্ধ ন্যাড়া সন্ত্রাসীদের এই পাশবিক হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হয়ে আরাকানে একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে। আমরা দেখেছি- এই তো বিগত কয়েক মাসেও এসব মিটিং-মিছিল, মানববন্ধনসহ শান্তিপূর্ণ লংমার্চ, মাহফিল, সভা-সেমিনার, টকশোতে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর শ্লোগানের ঝড় ওঠেছিল।

কিন্তু এখন আর সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চোখে পড়ে না। এখন আর আরাকান নিয়ে শ্লোগানও ওঠে না। লেখকদের কলমের কালিতে আজ নব নব ইস্যু চিত্রিত হচ্ছে; বক্তার বয়ানেও নতুন নতুন বিষয় ধ্বনিত হচ্ছে। খুব দ্রুতই পাল্টে যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনগুলোর দৃশ্যপট। আরাকান-রোহিঙ্গা শব্দগুলো এখন পুরাতন পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হয়েই চোখে ভাসছে। তাহলে, কি আরাকানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে?

আমরা যদি আমাদের নিকটতম আরেকটি মুসলিম ভূখণ্ড কাশ্মীরের দিকে লক্ষ্য করি; আর আমাদের নিকট স্বাভাবিকতার স্বরূপ কি? তা বিশ্লেষণ করি। তাহলে, সেই প্রশ্নের উত্তর পাবো; যা আজ নিজেই নিজের কাছে বারবার জিজ্ঞাসিত হচ্ছি- আরাকানের পরিস্থিতি কি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে? ইন্ডিয়ান গো-পূজারী হিংস্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক 'বুরহান ওয়ানী' নামক মুসলিম বীর নওজোয়ানকে হত্যা করার পর থেকে একটানা প্রায় ১৩০ দিনেই শতাধিক মুসলিম গো-বাহিনীর বুলেটে প্রাণ হারিয়েছিল; পেলেট আক্রমণে আহত হয়েছিল দশ হাজারেরও অধিক মানুষ। তখন মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে 'কাশ্মীর, কাশ্মীর' শ্লোগান ওঠেছিল; প্ল্যাকার্ড আর ব্যানারে 'কাশ্মীর, কাশ্মীর' শব্দই বড় করে লেখা ছিল। তারপর যখন গো-পূজারীরা সাময়িকভাবে হত্যাযজ্ঞের ধরন বদলিয়ে ভিন্নভাবে নির্যাতন শুরু করল; আর কুফফার মিডিয়াগুলো থেকেও 'কাশ্মীর' শব্দের উচ্চারণ বন্ধ হয়ে গেল।

ঠিক তখনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল মুসলিম শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ‘কাশ্মীর, কাশ্মীর’ ধ্বনি; মুছে গেল প্ল্যাকার্ড আর ব্যানার থেকেও ‘কাশ্মীর’ শব্দটি। কারণ, এখন কাশ্মীরের অবস্থা স্বাভাবিক। প্রতিনিয়ত দু’একজন মুসলিমের রক্তক্ষরণের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তখনই ডাকা হবে; যখন ব্যাপকভাবে মুসলিম নিধন চলবে; আর কুফফার মিডিয়াতেও তা প্রচারিত হবে। তাগুত বিশ্বমোড়লরাও কিছু বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জানাবে।

আর এভাবেই মানুষের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেল কাশ্মীরের পরিস্থিতি; যদিও এখনও সেখানকার মুসলিমদের নাপাক মুশরিকদের কাছে নত হয়ে থাকতে হয়; তাদের কুফরি আইনের অধীনে জীবন যাপন করতে হয়। যদিও গো-পূজারীদের দ্বারা পবিত্র মসজিদসমূহ তালাবদ্ধ থাকে; মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় ইবাদাতগাহ থেকে। কেন জানি, সব শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের একটাই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কাফের-মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে থাকার একটুখানি আকুতি। এটাই হলো স্বাভাবিক পরিস্থিতির ব্যাপারে বেশির ভাগ মুসলিমদের ভাবনা। আর শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীরা তো এতটাই শান্তির দূত যে, মুসলিমদের রক্তস্রোতে দাঁড়িয়েও কাফের-মুশরিকদের বলতে পছন্দ করে- আমরা শান্তিপ্রিয়; আমাদের দ্বারা তোমাদের কোন রক্তপাত হবে না; তোমাদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

হায় মুসলিম উম্মাহ! মুমিনের রক্তক্ষরণ নিজেদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেল! অথচ যারা লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের রক্ত ঝরায়; তাদের একটু নাপাক রক্ত ঝরলেই মায়াকান্না শুরু হয়ে যায়! এবার আরাকানের দিকে চেয়ে দেখি– তাও কি কাশ্মীরের মত অদ্ভুত এক স্বাভাবিকতার পুনরাবৃত্তি নয়? এখনও তো দক্ষিণা বাতাস থেকে আরাকানি মুসলিমদের পোড়া লাশের গন্ধ বয়ে আসে। শোনা যায়- ধর্ষিতা বোনদের করুণ আর্তনাদ। বিধবা নারীদের হাহাকার, আহাজারি। আমাদের মুসলিম শিশুদের কান্নার রোল। ক্লান্ত-শ্রান্ত নিথর দেহে বৃদ্ধ বাবার মলিন চেয়ে থাকা। এখনও তো নাফ নদীর স্রোতে রক্তের প্রবাহ বয়ে যায়। এখনও তো সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের কলমে বৌদ্ধ ন্যাড়া সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হয়। এখনও তো মুসলিমদের ঘরবাড়িতে আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে ওঠে। এখনও তো আপন ভূমিতে বন্দীদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আছে অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোন। এখনও তো মুসলিম নামধারী বাংলাদেশে উদ্বাস্তুর মত মানবেতর জীবন যাপন করছে হাজার হাজার মুহাজির রোহিঙ্গা মুসলিম। এখনও তো একমুঠো খাবারের জন্য আমাদের আরাকানি মুসলিম ভাই-বোনদের ভিক্ষুকের মত পথে নামতে হয়।

হে মুসলিম! হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাত! তাহলে কিভাবে স্বাভাবিক হয়ে গেল আরাকানের পরিস্থিতি? যদি স্বাভাবিক না-ই হয়ে থাকে; তাহলে কোথায় আজ সেই কথিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন-কর্মসূচি? কোথায় আরাকান অভিমুখে লংমার্চ? কোথায় উম্মাহর জন্য মানববন্ধন? আফসোস তাদের জন্য! যারা ভাবছি; এক-দু’টা মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করে, কিছুক্ষণ মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে থেকে, আর কিছু ত্রাণ পাঠিয়েই আমরা নিজেদের দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছি! রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য আমাদের কি আর কোন কিছুই করার নেই? প্রয়োজনের তুলনায় দু-একবারের এই সামান্য ত্রাণই কি যথেষ্ট হয়ে গেছে?

হে মুসলিম! হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত! এমতাবস্থায় কি করণীয়?- সে ব্যাপারে কি মহান রবের কোন বিধান নেই? যদি থেকে থাকে; তবে সেই বিধানের সাথে আমাদের কথিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কতটুকুই বা মিল? মহান আল্লাহ আমাদের যে দু’টি চোখ দিয়েছেন; তা দিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে দেখি। তিনি আমাদের যে যবান দিয়েছেন; তা দিয়ে এ আয়াতখানা অন্তত আরও একবার তিলাওয়াত করি। তিনি আমাদের যে অন্তর দিয়েছেন; তা দিয়ে এই আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করি। অর্থ না বুঝে আসলে; বাংলায় অনুবাদ দেখে নিই। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করি- পরীক্ষা কি শুধু আরাকানি মুসলিমদের উপর দিয়েই চলছে? তাদেরকে জালিম সন্ত্রাসীদের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের উপর কি পরীক্ষা চলছে না? পরিশেষে আরও একবার মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রশ্ন করছি- আরাকানের পরিস্থিতি কি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে?

بسم الله الرحمن الرحيم

# জামাআ'ত কায়েদাতুল জিহাদ-এর প্রধান কার্যালয় হতে

## শায়খ আবুল খায়ের আল-মিসরী' রহ. এর শাহাদাত প্রসঙ্গে কিছু কথা

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

'আর যারা আল্লাহর রাহে শহীদ হয়, তাঁদেরকে তুমি কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তাঁরা জীবিত। তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাঁদেরকে যা কিছু দান করেছেন; তাঁরা তাতে প্রফুল্ল। আর যারা তাঁদের পেছনে রয়ে গেছে, এখনও তাঁদের কাছে এসে পৌঁছে নি; তাঁদেরকে তাঁরা এই বলে সুসংবাদ প্রদান করে–তাঁদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং তাঁরা দুঃখিতও হবে না। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণেও আনন্দ উদযাপন করে। এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ ঈমানদারদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না'। -সূরা আলে ইমরান: ১৬৯-১৭১

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল যুগের সকল মানুষের নেতা আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর; যিনি জগতের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর পরিবার ও সকল সঙ্গীদের উপর।

শাহাদাত এক মহা নেয়ামত; মহান রবের পক্ষ থেকে বিশেষ করুণা ও সম্মান। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছে, তাঁকে দান করেন এ মহান মর্যাদা। তিনি আপন প্রিয় বান্দাদের এ নেয়ামত দানের জন্য নির্বাচন করে নেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾

'এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার? আর তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না'। -সূরা আলে ইমরান: ১৪০

তিনি আরও বলেন–

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾

'আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে; তাহলে যাঁদের উপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন– নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ'। -সূরা নিসা: ৬৯

যেহেতু শাহাদাত মানে হল সম্মানের শীর্ষচূড়া। তাই আমরা যে কোন ভাইয়ের শাহাদাতে আনন্দিত হই, কখনও শোক প্রকাশ করি না। আমরা নিজেদের অশ্রু সংবরণ করি, বিলাপ করি না। এরই ধারাবাহিকতায় উম্মাহকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি– সম্মানিত শায়খ আবুল খায়ের (আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ রজব) আল-মিসরী'র শাহাদাতে। ক্রুসেডার আমেরিকার বিমান হামলায় ইদলিবে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ আবুল খায়ের আল-মিসরী রহ. তিন দশক ধরে শাহাদাতের তামান্নায় জিহাদের ময়দানে ছুটে ছিলেন। এর মাঝে সম্মুখীন হয়েছেন নানান পরীক্ষার। এ পথে করেছেন কঠিন পরিশ্রম এ দীর্ঘ পথ চলায় তিনি কখনও ক্লান্ত হন নি; বরং প্রতিবারই তাঁর সংকল্প আর শাহাদাতের অদম্য বাসনা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল।

তিনি দির্ঘসময় ইরানে কারাবন্দি ছিলেন। অত:পর কারাগার থেকে মুক্তির পর তিনি নিজের গন্তব্য শামের ভূমিতে স্থির করেন। প্রিয় ভাইদের সাথে আবির্ভূত হন নুসাইরিদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে। পরিকল্পনা ও পরিচালনা অধিদপ্তরে থেকে তিনি নিরলসভাবে লড়াইয়ের কাজ চালিয়ে যান। অবিরাম আপন দায়িত্ব পালন করেন কঠিন রোগ আর বাধা-বিপত্তির মুখেও।

শায়খ রহ. ছিলেন আফগানিস্তানে আরবের অগ্রবর্তী মুহাজিরদের অন্যতম। জিহাদের ময়দানে তিনি শায়খ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উমর আব্দুর রহমান, শায়খ তামীম আদনানী, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মনসুর, শায়খ আবু উবায়দা বানশিরী, শায়খ আবু হাফস আল-মিসরী' (রহিমাহুমুল্লাহু) এর মত অকুতোভয় সিংহপুরুষদের সঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন সম্মানিত মুজাহিদদের সাথী, যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কান্দাহারের দিনগুলোতে তিনি শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সফর ও আবাসের একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। তিনি কাজ করতেন নম্রতার সাথে। আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত করুন! তার মর্যাদা উঁচু করুন! তিনি ইমারাতে ইসলামিয়ার পরামর্শ সভায় আল কায়েদার প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর সাথে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মান ও ভালবাসার এক অপূর্ব সম্পর্ক ছিল।

মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদীননের প্রতি আমাদের বার্তাঃ-

মুসলিম ভূমিগুলোতে প্রতিনিয়ত ইহুদী-খ্রিস্টানদের নির্যাতনের স্টিমরোলার চলছে; আর মহান আল্লাহ তাআ-লাও এই জামাআ'র নেতৃবর্গ, সৈনিক, শায়খ, যুবক, মহিলা ও শিশুদের থেকে আপন প্রিয় বান্দাদের শহীদ হিসেবে কবুল করেন।

আর আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করছি- সর্বদা আমরা জিহাদের পথে অবিচল থাকবো; যতক্ষণ না তিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করে আপন দ্বীনকে বিজয়ী করেন। কোন আমীরের, কোন নেতার নিহত হওয়ার কারণে আমরা বিরত হবো না; বরং অবিচলভাবে এ পথে সম্মুখে অগ্রসর হবো। কোন বিপদই আমাদের থামাতে পারবে না। আমেরিকা ও তার সঙ্গীদের থেকে ইসলামের হক ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত, মুসলমানদের ওপর তাদের কৃত অপরাধের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমরা শান্ত হবো না। যারা আমাদের সিংহপুরুষদের হত্যা করেছে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা কোন কল্যাণের আশা করতে পারি না।

মহান রবের বাণী–

﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

"আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুগত হয়ে জিহাদ করেছেন; আল্লাহর পথে তাঁদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে; কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায় নি, ক্লান্তও হয় নি এবং দমেও যায় নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাঁদেরকে ভালোবাসেন।" -সূরা আলে ইমরান: ১৪৬

**জামাআ'ত কায়েদাতুল জিহাদ/প্রধান কার্যালয়**

জুমাদাল উখরা -১৪৩৮ হিজরী / মার্চ -২০১৭ ঈসায়ী
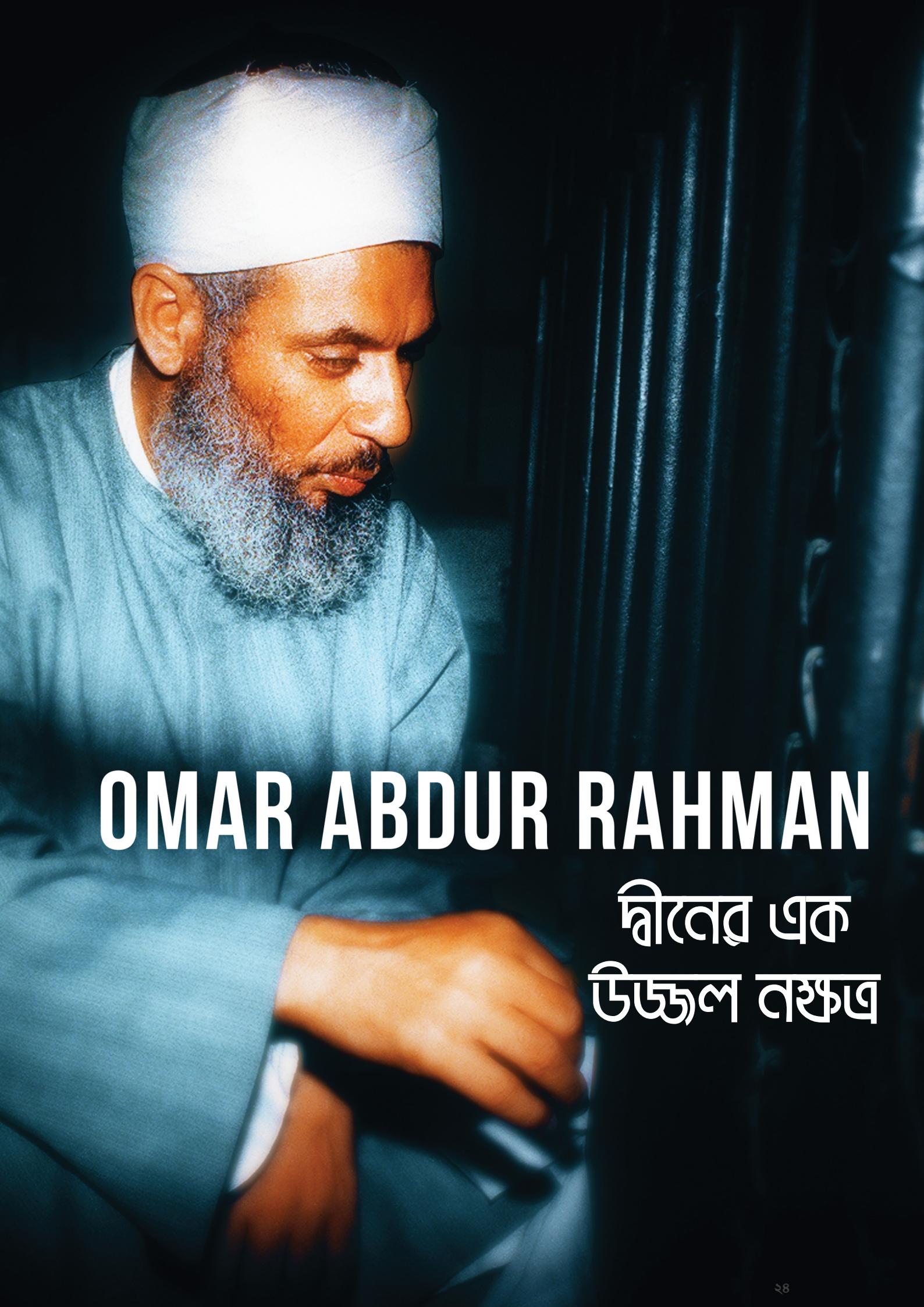
OMAR ABDUR RAHMAN
দ্বীনের এক
উজ্জ্বল নক্ষত্র

উমর আব্দুর রহমান– হাজার তারার মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

(আলেমগণ নবীদের উত্তরসূরী)। শায়খ উমর আব্দুর রহমান তাঁদেরই একজন।

তিনি ১৯৩৮ সালে মিশরের জামালিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র দশ মাস; তখন তিনি চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারান। পৃথিবীর আলো দেখতে পারেন নি। তবে হ্যাঁ! তিনি নিজেই তো ছিলেন প্রদীপতুল্য। চর্মচক্ষু তাঁর দৃষ্টি হারালেও; দৃষ্টি হারায় নি তাঁর অন্তর্চক্ষু। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন– ইসলামি শরিয়ার জ্ঞানের জাহাজ। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দানের ভান্ডার এতটাই প্রশস্ত করেছিলেন যে, মাত্র এগার বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন মাজিদ সম্পূর্ণ হিফয করেন। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত খুবই সুন্দর ছিল। অন্তরে প্রভাব ফেলত। প্রতিটি হরফের উচ্চারণ কতই না সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতেন তিনি; যা শুনতেই মন চায়। তাঁকে ব্লাইন্ড শাইখও বলা হত।

হিফয শেষ করার পর, তিনি দিমইয়াতে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেখানে তিনি চার বছর পড়ালেখা শেষে সফলতার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর, তিনি ‘মানসুরা’ নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৬০ সালে ভালো রেজাল্টের সহিত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর শাইখ উমর আবদুর রহমান রহ. কায়রোর ‘উসূলুদ্দীন’ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেখানে তিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যায়ন শেষে ১৯৬৫ সালে সম্মানের সহিত ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের অধিনে এক মসজিদে ইমাম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এবং সহকারী শিক্ষক হিসেবে উক্ত কলেজে তিনি কর্মরত থাকেন। তিনি শরিয়াহ বিভাগের ওপর তাঁর স্নাতকোত্তর পড়াশুনা শেষ করে পরবর্তীতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাফসীরের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

যে পথে চলেছেন আদম আ.; নূহ আ. যে পথের ওপর চলতে গিয়ে কেঁদেছিলেন; আল্লাহর খলীল ইবরাহিম আ. যে রাহের ওপর অটল থেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; ইউসুফ আ. যে পথে দৃঢ় থেকে কারাবরণ করেন; যে পথে অবিচল থেকে আল্লাহর হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্যাতন ভোগ করেন; যে পথে ইমাম আবু হানীফা রহ. বন্দিত্ব বরণ করেন; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কারার নির্যাতন সহ্য করেন; ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. যে পথে অটল থাকার কারণে, জেলে গিয়েছিলেন– শাইখ উমর আব্দুর রহমান সে পথেরই এক সাহসী পথিক। এই বিজ্ঞ আলেমও সত্য প্রকাশে ছিলেন– সর্বদা নির্ভীক। জামাল আব্দুন নাসেরের পাশবিক সরকারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে মুসলিমদেরকে বলেছিলেন– এই অত্যাচারী মুরতাদের মৃত্যুর পর তার জানাযা না পড়তে। তিনি বলেছিলেন– “জামাল আব্দুন নাসের কাফের হওয়ার কারণে, তার জানাযা পড়া যাবে না।” এই ফতোয়া প্রদানের পর তাঁকে গ্রেফতার করে ‘আল-কালাহ’ জেলে বন্দী করে রাখা হয়।

আনোয়ার সাদাত যখন ইহুদিদের সাথে চুক্তি করে; উমর আব্দুর রহমান তখন তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেন। তাঁর এ ফতোয়ায় মুজাহিদ খালিদ ইসতাম্বুলী রহ. ইসলামের তৎকালীন শত্রু মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করেন। এরপর পুনরায় তিনি বন্দী হন। কারাগারে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হয়। ডায়াবেটিকস ও হাইব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও; তাঁর জন্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাবার সরবরাহ করা হয় নি।

আদালতে বিচারকের সামনে অকুতচিত্তে বলে গেলেন– “আমি আমার আকিদা অনুসারে নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলে যাব। চাই তাতে আমার জীবন বিলীন হয়ে যাক না কেন।... আমি একজন মুসলমান। আমি আমার দ্বীনের জন্য বাঁচি; আর এ পথেই মরতে চাই।” অথচ ফাঁসির রশি তখনও তাঁর ঘাড়ে ঝুলছে।

তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে লাগলেন– “হে বিচারপতি ! সরকারের ক্ষমতার চাইতে আল্লাহর ক্ষমতা বেশি। সরকার মান্য হওয়ার চাইতে আল্লাহ মান্য হওয়ার অধিক হকদার। যেহেতু সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই। শাসকদের আদেশগুলোকে মহান আল্লাহর বাণীর সাথে মিলিয়ে দেখ। যা কিছু তুমি এর সাথে সামঞ্জস্যশীল পাবে তা গ্রহণ কর। যা কিছু তুমি এর বিপরীত পাবে তা ছুঁড়ে ফেলে দাও।”

আশির দশকে তিনি আফগানিস্তানে গমন করেন। মিসরে জন্ম নেওয়া উম্মাহর মুজাহিদ আলিমদের অনেকের উস্তাদ এই প্রতিভাবান অন্ধ আলিম তাওহীদ ও জিহাদের এক বিরাট স্তম্ভের ভূমিকা পালন করেছেন। তারপর তিনি নব্বইয়ের দশকে আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকার ভিসা পাওয়ার পর এবং আমেরিকায় ইসলাম প্রচারের ইমাম হয়ে শায়খ তাঁর দাওয়াতি মেহনত অব্যাহত রাখেন। তাঁর দীপ্ত দাওয়াতি প্রচারণা অনেক মুজাহিদের চোখ খুলে দেয়। আল্লাহর শত্রুকে আক্রমণের প্রেরণা যোগায়। ১৯৯৩ সালে আমেরিকার কুফরী প্রশাসন তাঁর উপর চারটি অপবাদ আরোপ করে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়।

১.যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ২.হুসনি মুবারককে হত্যার অভিযোগ। ৩.সামরিক স্থাপনাসমূহ বিস্ফোরিত করা। ৪. যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শহরে যুদ্ধের জন্য উস্কানি।

তখন তিনি সিংহের গর্জন দিয়ে বলে উঠলেন–

“যদি কেউ ন্যায্য অধিকার পেতে হয় জঙ্গি; তাহলে আমরা জঙ্গিই। আর আমরা জঙ্গি হওয়াকে স্বাগত জানাই। কেননা, কুরআনই এই জঙ্গিবাদ তৈরী করে। কারণ, আল্লাহর পথে জিহাদ করার অন্যতম মাধ্যম হল আল্লাহর শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা।”

১৯৯৩ সাল থেকে বর্তমান তথা ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকার কারাগারে বন্দী ছিলেন। এছাড়া মিসরের তগুত শাসক আনোয়ার সাদাতকে হত্যার অভিযোগে তিনি ১৯৮১ সালের পর মিসরে তিন বছর কারা বরণ করেন। ৭৯ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর মধ্যে ২৭ বছরই কেটেছে জেলে !

সুবহানাল্লাহ ! উনারাই হচ্ছেন– সেইসব দুঃসাহসী আলিম; যাদেরকে উম্মাহর গুরাবারা অনুসরণ করে থাকেন। কুফফার-মুরতাদদের উচ্ছিষ্টভোগী দালালদেরকে নয়।

তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অন্তিম নসিহতে বলেন–

“আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের প্রধান টার্গেট হল– সত্য উচ্চারণকারী আলেমদেরকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় তারা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে, কুরআনের দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট কথাগুলো আমরা বারবার ভুলে যাই। এটা বিরাট এক সমস্যা।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন–

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

“তারা তোমাদের সাথে লড়াই করেই যাবে; যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে পারে; যদি তারা সক্ষম হয়।” -সুরা বাকারা: ২১৭

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

“তারা কোন মুসলমানের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করে না, আর না অঙ্গীকারের।” - তাওবা: ১০

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

“কাফেররা যদি তোমাদেরকে মুঠোর মধ্যে পায়; তবে শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করবে। আর তোমাদের অনিষ্ট সাধনে হাতসমূহ এবং জিহ্বাসমূহ চালনা করতে থাকবে। আর তারা এই কামনা করে– তোমরা কাফের হয়ে যাও।” - সুরা মুমতাহিনা: ২

এই কুফফার শক্তি কোন দেশেই ইসলামি আন্দোলনকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিবে না। তাদের লড়াই'ই হল– ইসলামি শক্তির বিরুদ্ধে। আর তাদের পরম লক্ষ্য হল– দুনিয়াব্যাপী যিনা-ব্যভিচার, সুদ-মদ ইত্যকার অন্যায় ছড়িয়ে দেয়া।

আল-কায়েদার মুজাহিদগণ কুফফার আমেরিকার বন্দীদের বিনিময়ে এই মুজাহিদ আলিমকে মুক্ত করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু, আমেরিকা শাইখের মুক্তি দিতে রাজী হয়নি। সম্প্রতি শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরি (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করেন) সহ আরও অনেক মুজাহিদিন শায়খরা তাঁর মুক্তির দাবি জানায়; অথচ, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ছিল নিশ্চুপ।

সুবহানাল্লাহ ! একজন বয়স্ক অন্ধ আলিমকেও আমেরিকা কত ভয় পায় !

পরিশেষে, তারা ধীরে ধীরে শায়খকে হত্যা করে। সাইলেন্ট কিলিং। খাদ্য-পানিতে বিষ মিশিয়ে। শরীর বিধ্বংসী পাওয়ারফুল ওষুধ মিশিয়ে। মারাত্মক ক্ষতিকর ওষুধ সেবন করতে বাধ্য করে। কখনও কখনও চেতনানাশক ওষুধ খাওয়ায়; যাতে মারা যায় বা পাগল হয়ে যায়।

শায়খ বর্ণনা করেন– “বিশেষ করে আমি আমার উপরতলা থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে প্রচন্ড রকমের অজানা দুর্গন্ধ পাই। সেই সাথে আসতে থাকে পুরোনো এসির ঘরঘর বিকট শব্দ। মনে হয়– গুলি করা হচ্ছে আমাকে। রাতদিন অনবরত এই দুর্গন্ধ ও বিকট শব্দে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

তারা যদি আমাকে হত্যা করে, আর তারা অবশ্যই তা করবে; তাহলে আমার জানাযা পড়িয়ে আমার মরদেহ আমার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। যাতে করে, আমার রক্তকে আপনারা ভুলে না যান; বরং আমার এই রক্তের বদলা আপনারা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে নিন। আর এই ভাইকে স্মরণে রাখবেন; যিনি সত্য প্রচার করেছিলেন। এবং আল্লাহর জন্য নিহত হয়েছেন।”

প্রাণপ্রিয় শায়খকে আমেরিকা নামক জানোয়ার রাষ্ট্র কষ্টের পর কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলে। এটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি হিংস্র সন্ত্রাসী ট্রাম্পের উপহার (!)

দৃঢ়চেতা এই মহাপুরুষ দীর্ঘ ২৪ বছর আমেরিকার কারাগারে বন্দী অবস্থায় ৭৯ বৎসর বয়সে ১৯/০২/২০১৭ তারিখে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

পরিশেষে শাইখের সেই উক্তিই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই; যা তিনি আদালতে, কারাগারে, পারিবারিক সাক্ষাতে বলতেন– “জেল ফাঁসি আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে না; মুক্তি বা খালাস আমাকে মোটেও উৎফুল্ল করে না।”

মহান আল্লাহ আমাদের এমন বীর মহাপুরুষদের পথে চলে শাহাদাতের সুমিষ্ট স্বাদ আস্বাদন করার সৌভাগ্য নসীব করুন! আমাদের একত্রিত করুন– জান্নাতে শুহাদাদের মিলন মেলায়। আমীন! ইয়া রব্বাল মুজাহিদীন!

[ভাই আহমদ আত তুরকিস্তানির একটি অডিও সাক্ষাৎকার থেকে ধারণকৃত]

# আল্লাহর পথে হিজরত

আহমদ আত-তুরকিস্তানী

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্যে। সালাত ও সালাম শেষ নবীর ওপর; যার পরে আর কোন নবী আগমন করবেন না। পর সমাচার–

আলহামদুলিল্লাহ! আমি একজন মুসলিম হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছি। জন্ম গ্রহণ করেছি– একটি মুসলিম পরিবারে। কিন্তু, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি আমি ছিলাম– একেবারে বেখেয়াল। তবে, আল্লাহর করুণায় ২০০৫ সালে আমি একজন মুত্তাকী ভাইয়ের সাক্ষাত লাভ করি। তিনি আমাকে দেখালেন– হেদায়েতের আলোকিত পথ। আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুক! তিনি আমাকে শরীয়তের ইলম শেখার উপদেশ দেন। আর আমি তাই করলাম। মাদরাসার লেখাপড়া আমার জীবনের গতি বদলে দেয়। ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে যায়– ছাত্র ভাইদের জন্যে। আমরা একে অপরের সাথে চিন্তা বিনিময় করতাম। সাহায্য করতাম– একজন অপরজনকে। এ যেন একটি পরিবার!

বছর দুয়েক পর নিজ গ্রামে ফিরে আসি। তারপর, শহরে পাড়ি জমাই– কোন কাজের খোঁজে। কিন্তু, যখন রাস্তার ওপর যত্রতত্র অশ্লীল কাজের সয়লাব দেখি; আমার অন্তর কষ্টে ফেটে পড়ে। আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি– আমার একাকিত্বে। দয়াময়ের কাছে ফরিয়াদ করলাম– তিনি যেন আমাকে এ অশ্লীল অঙ্গন থেকে মুক্ত করেন। আমাকে দিশা দেন–সঠিক পথের। অতঃপর, আমি হিজরতের মাঝেই দেখতে পাই– এ অশ্লীল পরিবেশ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় । কিন্তু,

অভাবের তাড়নায়– এ বিষয়ে আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। কিন্তু, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ পথে বের করার ইচ্ছা করেছেন।

আমি আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। তারপর, আবার আমার মনে আন্দোলিত হয়ে ওঠল– নতুন করে হিজরতের প্রেরণা। তিনি জানালেন– "হিজরতে বের হওয়ার রাস্তা তার জানা আছে।" আমাকে আরও বললেন– "যদি তুমি আমাদের সাথে এ কাজের সাথী হতে চাও। তবে, আমি তোমার সহায়তা করব।" জানালেন– "আমাদের হিজরত হবে কষ্টের। পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হবে– পাহাড়ী পথ।"

পরামর্শের জন্যে আমার একজন উসতাযের কাছে গেলাম। আমার শিক্ষাজীবন থেকেই তাঁদের সাথে পরিচয়। আর তিনিও আমাকে হিজরত ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহতে যেতে উৎসাহিত করতেন। ঐ সময় তিনি আমার মাঝে ভয় আর পরিবারের মায়া দেখেছেন।

কিন্তু, হঠাৎ তিনি পরিবর্তন হয়ে যান। পরিবর্তন দেখা দেয়– তাঁর কথায়। তিনি আমাকে আটকাতে লাগলেন। আমাকে জিহাদের পথে যেতে বারণ করলেন। কিন্তু, কিছু সময় পরে আমার মনে আল্লাহর কালামে এ বিষয়টির হুকুম দেখার ইচ্ছা জাগে। এ সময় আমি তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে সহায়তা পাই। আমার ওপর আল্লাহর আরেকবার দয়া। আমার চোখ পড়ল এ আয়াতে– "আর মুমিনরা আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।" তারপর আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিলেন। সকল কুহেলিকা দূর করে দিলেন। যা আমার পথকে আটকে রেখেছিল। আমাকে ফেলেছিল– প্রতারণায় । আমার কাছে হিজরতের সব বিষয় খোলাসা হয়ে গেল। আমার হিজরত আমার সৌভাগ্য।

যখন আমি চিন্তা করলাম। হিজরতের ওপর দৃঢ় হলাম। স্ত্রীর ভালোবাসা আর পরিবারের মায়া আমাকে পিছু টানতে পারে নি। আমি তখন এ থেকে ছিলাম– শত ক্রোশ দূরে। এমনকি আমি নিজে নিজেই বলে ওঠলাম– "আমি কি অনুভূতিহীন কোন প্রাণী-!" আমি আমার পরিবার-পরিজন, ভালোবাসার স্বজন ছেড়ে চলে যাচ্ছি! কিন্তু, আল্লাহর শোকর, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার অন্তরে শান্তির ফোয়ারা ঢেলে দিলেন। অবশেষে, আমরা দশজন ভাই মিলিত হলাম। পায়ে হাঁটার রাস্তায় পৌঁছতে গাড়িতে চড়লাম। আর অচিরেই শুরু হবে– পদব্রজ, ইনশাআল্লাহ!

অবশেষে, পৌঁছলাম কাঙ্খিত জায়গায়। গাড়ি থেকে নেমেই রাত-দিন একটানা হাঁটতে হল। এক জায়গায় বসলাম– কিছুটা আরামের আশায়। আশপাশে প্রচন্ড ঠান্ডা। আর আমরা ছিলাম– সীমান্তবর্তী পাহাড়ে; রাতে হাঁটতাম, দিনে আরাম করতাম। যেন, কেউ না দেখে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এবার পাহাড়ী গুহার পাশ কেটে পাথুরে পথ ধরলাম। রাতের গাঢ় কালো আঁধার– কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা আমরা এগিয়ে যাচ্ছি– কেবলার দিকে, ধীরে ধীরে; সূর্য অস্ত যায় যেদিকে। জানতাম– এদিকেই আমাদের গন্তব্য, আর এদিকেই আমাদের উদ্দিষ্ট স্থল।

এক রাতে প্রস্তারাকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আঁধারে ছেয়ে আছে চারদিক; আর সেখানেই রাত কাটাতে হল। মনে হচ্ছিল– মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল। সবাই ভিজে গেলাম সামানসহ। কাছে থাকা ব্যাগগুলো দিয়ে কোন রকম নিজেদের বৃষ্টি থেকে বাঁচালাম। ফজরের সময় ওঠলাম ঘুম ছেড়ে। শীতের প্রকোপে দাঁতের সাথে দাঁতের ঘর্ষণ হচ্ছিল। নামাজ পড়ে আবার অব্যাহতভাবে চলল– আমাদের পথ চলা। প্রকৃতিও তখন হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত।

আশপাশে রাখালরা ছাগল চরাচ্ছে; তাই কিছুক্ষণ পরই পাশের একটি বনে আশ্রয় নিলাম। আসরের পর আমাদের পথ চলা আবার শুরু হল। ততক্ষণে কুয়াশায় আছন্ন হয়ে গেছে চারপাশ। সহসা সূর্যের আলোও হারিয়ে গেল; আমরা দিক ঠাহর করতে পারছিলাম না। নিরুপায় হয়ে হাঁটছিলাম– সামনের দিকে। আমরা শুনতে পেলাম– কেউ একজন কাঠ কাটছে। নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারলাম– আমরা এখন এক রাখালের বাড়িতে। তাই বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ানোর বৃথা চেষ্টা করলাম। কিন্তু, একপাল ছাগল আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। মনে হল– গাছের পেছনে পলায়ন করা নিরাপদ। তবুও বাঁচা গেল না; বাড়ির কুকুরটা আমাদের ধরে ফেলল। আর কুকুরটাও ডাকছিল অনবরত। অবশেষে, আমাদের দিকে দু'জন লোক এগিয়ে এল। আমরা মনে মনে বললাম– "এই বুঝি শেষ!"

তাদের একজন আমাদের কাছে এসে বলল– "কারা তোমরা? এখানে এলে কিভাবে?" আমাদের কেউ একজন উত্তর দিল– "আমরা মুসাফির। এখানে ভ্রমণে এসেছিলাম; কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলি।" তাদের একজন বলল– "তোমরা কি অন্যদেশে পালাতে চাইছো?" আমরা না সূচক মাথা নাড়লাম। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তারা বুঝতে পারল– আমরা মুসলিম। আমাদেরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করল। সেখানে আমরা কিছু সময় আরাম করলাম। তাদের মা আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন– "যদি তোমরা এই পাহাড়ের পিছনে চলে যেতে; তবে তোমাদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেত।" আল্লাহর শোকর আদায় করলাম আমরা; তিনিই আমাদের হেফাজত করেছেন। আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

আমাদের মনের খবর জানার পর, তারা আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। আমরা বনে ফিরে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর, আল্লাহর নামে অগ্রসর হতে লাগলাম– পাহাড়ের চূড়ার দিকে। চলার পথেই শুরু হল বৃষ্টি। চূড়ায় ওঠে সামনের শহরের দিকে যাত্রা করলাম। হাঁটতে হাঁটতে রাত হয়ে গেল। আর রাতটাও ছিল খুব অন্ধকার। আমরা আলোও জ্বালাতে পারছিলাম না। হঠাৎ শুনতে পেলাম– কেউ আমাদের দিকে আসছে। ভেবেছিলাম– চীনা সেনা হবে। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে প্রায় আধঘন্টা যাবৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাঁপছিলাম– শীতের প্রচন্ডতায়। শরীরের উষ্ণতা ক্রমশ নিচে নামতে লাগল। ভাবছিলাম– চাইলেও আমরা আর ফিরে যেতে পারব না। সৈন্যরা আসলে আমরা পালাতেও পারব না। তাই, নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিলাম। ভরসা করলাম– একমাত্র আল্লাহর ওপর। সিদ্ধান্ত নিলাম– আমরা আমাদের সফর পূর্ণ করব। যদি চীনের সৈন্যরা আমাদের ধরে ফেলে; তবে, এই ছুরি হাতেই তাদের হত্যা করব। আর যদি আমরা নিহত হই; তাহলে, তা হবে– আল্লাহর পথে শাহাদাত, ইনশাআল্লাহ! সকাল পর্যন্ত আমরা হাঁটতে লাগলাম। আমাদের পোষাক থেকে বৃষ্টির পানি ঝরছিল। আমরা আগুনও ধরাতে পারলাম না; কারণ, ধোঁয়ার উপস্থিতিতে রাখালরা অবস্থান জেনে যাবে। ভেজা-ঠান্ডা কাপড়েই শুয়ে পড়লাম। পাহাড়ের মাঝে আমাদের সফর ছয় দিন যাবৎ চলতে লাগল। আর পাহাড়গুলো ছিল– খুবই পিচ্ছিল। আমরা নিজেদেরকে গাছের সাথে ঠেক দিয়ে চলছিলাম; যেন ঘুমের কারণে, নিচে না পড়ে যাই।

এভাবেই আমাদের সফর চলতে থাকল। পাশের শহরের তালাশ করতে করতে একটি চারণভূমিতে এসে পড়লাম। আর এর মাঝ দিয়ে এগুতে লাগলাম। তা পূর্ণ ছিল– লম্বা লম্বা ঘাসে। সারা রাত চলার পর, বড় দরজার কাছে আসলাম। এর পিছনেই তিনটি ঘর। বাড়িকে পিছনে ফেলে আমরা দৌড় লাগালাম– উঁচু ভূমির দিকে। ঘন ঘাসের মাঝে কাটিয়ে দিলাম– পুরো রাত। ফজরের নামাজ পড়ে আবার সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম– দক্ষিণ পাশে কংক্রিটের তৈরি একটি টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। মনে করলাম– এটা পাশের দেশের প্রাচীর। পরে উত্তর দিকে দৃষ্টি দিলাম; সেদিকে লোহার লম্বা টাওয়ার দেখলাম। আমরা মনে করেছিলাম– এগুলো নেটওয়ার্ক টাওয়ার। পরে বুঝলাম– নেটওয়ার্ক টাওয়ার নয়; এগুলো পর্যবেক্ষক টাওয়ার। একটি চীনে, অপরটি পাশের দেশে। আর আমরা এ দু'টোর মাঝে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল– আমরা সূর্যাস্তের পরে রওয়ানা দিব।

রাতে তিন ঘণ্টা হাঁটার পর সামনে পেলাম– কাঁটাতারের প্রাচীর। এতে সামনে আর এগুতে পারলাম না। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল– পাহাড়ী অঞ্চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা প্রাচীর ঘেষে চলতে থাকব। কারণ, পাহাড়ের মধ্যে প্রাচীর বানানো হয় নি।

আমরা চলতে লাগলাম; আর দু'প্রাচীরের মাঝে একটি রাস্তাও পেয়ে গেলাম। আমরা এর ওপর দিয়ে চলতে থাকলে, একসময় গাড়ীর রাস্তা পেয়ে যাব। এই রাস্তাটা দু'টি দেশের মাঝখানে। আর এটি একটি সীমান্তপথ; যা নজরদারী করার জন্যে বসানো হয়েছে। আমরা সবাই জানতাম– যদি সেনাবাহিনীর গাড়ি আসে; তাহলে আমরা এই দেশ ত্যাগ করতে পারব না। অবশেষে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা হাঁটতে থাকলাম– দিগন্তপথে। যেখানে আছে মুক্তির মোহনা, শান্তির ফোয়ারা। প্রায় ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর আল্লাহর করুণায় প্রাচীরের কাঁটাতারের মাঝে একটি ফাঁক পেলাম। যা বৃষ্টির কারণে তৈরি হয়েছে। আমরা ওখান দিয়ে প্রবেশ করলাম। আর এভাবেই প্রবেশ করলাম– পার্শ্ববর্তী দেশে! সে সময় আমাদের যে, কি আনন্দ লাগছিল! তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার এই অনুগ্রহে আমরা তাঁর অনেক শুকরিয়া আদায় করলাম।

প্রতিবেশী দেশে প্রবেশ করে, আমরা নিকটবর্তী পাহাড়ে চড়লাম। সেখানে অনেক আলো দেখা যাচ্ছিল। আর লক্ষ্য করলাম– দু'শ মিটার দূরে সেনাবাহিনীর একটি তাঁবু দেখা যাচ্ছে। যদি আমরা ওদিকে পনের মিনিট হাঁটতাম; নিঃসন্দেহে তারা আমাদের ধরে ফেলতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা তাদের নাকের ডগা দিয়ে হেঁটে আসলাম; তারা আমাদের দেখতে পায় নি। আমরা আমাদের সফর চালিয়ে গেলাম– পশ্চিমের দিকে।

আমাদের কাছে এই দেশে অবস্থানকারী ভাইদের মোবাইল নাম্বার আছে। কিন্তু সমস্যা হল– বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের মোবাইলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে, আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। পূর্ণ একদিন আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। তারপর সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলাম– আমরা আমাদের সফর পূর্ণ করব।

পুরো এক রাত হাঁটার পর আমরা সমতল ভূমিতে পৌছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা দু'ঘণ্টা যাবৎ হাঁটতে থাকলাম। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম– এক কৃষি জমির ওপর। সেখানে এক কিলোমিটার দূরত্বে একটি বাড়ি ছিল। আমরা ঝুঁকি পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আর চলে এলাম পাহাড়ী পথে। অনেক দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আরাম করলাম। আর আমরা কিছু রাখালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেও; তাদের সাথে কোন কথা বলি নি। তারাও আমাদের সাথে কোন কথা বলে নি।

আমাদের সাথে যে পরিমাণ খাবার ছিল; তা শেষ হয়ে গেল। খাবার কেনার দোকান– এখান থেকে প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার দূরে। দুই ভাই খাবার আনতে গেলেন; আর বাকীরা অবস্থান করছিলাম– পাহাড়ে। আমরা মাগরিবের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম; কিন্তু তারা তখনও ফিরে নি। তাদের জন্যে আমাদের দুশ্চিন্তা হতে লাগল।

আমরা এ দেশের ভাষা বুঝি না। সাথে তেমন অর্থকড়িও নেই। আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না– আমাদের কী করা উচিত। তাই, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে, একনিষ্ঠ মনে দোয়া করতে লাগলাম। আর আমরা সেখানেই রাত কাটালাম– ঐ দুই ভাইয়ের অপেক্ষায়।

ফজরের সময় ওঠে দেখি– আমাদের ঐ দুই সাথী ফিরে এসেছে। তাদের দেখে– আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। তারা খাবার নিয়ে এসেছে; সবাই খাবার খেয়ে নিলাম। তারা বলল– "রাখালদল আমাদের পাহাড়ে অবস্থানের কথা সেনাবাহিনীকে বলে দিয়েছে। তারা এখন আমাদের তালাশ করছে।"

আমরা সূর্যোদয়ের আগে আগে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলাম। যেহেতু আমরা দিনে বের হই না; তাই, আমরা একটি জায়গা খুঁজতে থাকলাম। উপযুক্ত একটি জায়গা পেয়েও গেলাম। তখন আমরা সবাই ছিলাম– ভয়ার্ত। একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছিলাম– "অবশেষে আমরা কি জিহাদের ভূমিতে নিরাপদে পৌছতে পারবো!?"

মাগরিবের নামাজের পর আমরা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ফজর পর্যন্ত চললাম। সবাই পিপাসার্ত ছিলাম; কিন্তু পানি পাচ্ছিলাম না। খাবারও তেমন নেই। নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হল; আমরা কিছু লোক যাব– পাহাড়ের দিকে; আর কিছু যাব– খাবার সংগ্রহের জন্যে গ্রামের দিকে। একজন ভাই পরামর্শ দিলেন– আমরা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে চলতে থাকলে হয়তো তরমুজ পেয়ে যেতে পারি। অথবা খাওয়ার জন্যে অন্য কিছু পেয়ে যাব। আমরা তার এই ভাবনার প্রশংসা করলাম। আর সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনে দু'টি কূপ পেলাম। আমাদের এক ভাই কূপের পাশে গেল। কূপ দু'টি শুকিয়ে কাঠ সদৃশ হয়ে আছে। পানির পরিবর্তে সে আমাদের কাছে একটি কবুতর নিয়ে আসল। পরে রান্না করার জন্যে আমরা সেটাকে জবাই করলাম। আমাদের দু'সাথীর ক্রমশ রোগ বেড়ে যাচ্ছিল। তারা চেয়েছিল– আমরা যেন তাদের রেখে সামনে এগিয়ে যাই; আর আমাদের সফর পূর্ণ করি। আমরা তাদের কথায় কান দিলাম না; বরং তাদের নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আবহাওয়া তখন খুব গরম। সমতল পথে চলতে চলতে এক সময় আমরা একটি ছোট খালের সামনে এসে পৌছলাম। সেখান থেকে পানি পান করলাম। এবং গোসল সেরে নিলাম। আর খেয়ে নিলাম– আমাদের সাথে সর্বশেষ যা ছিল; তাও।

সামান্য বিশ্রামের পর আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে পেয়ে গেলাম– কাঙ্খিত পথ। সামনেই দেখলাম– তরমুজ ও ফুটির ক্ষেত। আমরা সেখান থেকে কিছুটা খেয়ে নিলাম। তারপর, দু'জন ভাইকে পাঠালাম– এখানে অবস্থানরত আমাদের ভাইদের পর্যন্ত পৌঁছার পথ খুঁজতে। আমরা তরমুজের ক্ষেতেই রয়ে গেলাম; আর অসুস্থ ভাইদের জন্য কবুতরের স্যুপ তৈরি করলাম। তাদেরকে খাইয়ে আমরাও কিছুটা খেলাম।

সেখানে তিন রাত অবস্থান করেছি আমরা। এরই মাঝে অসুস্থ দুই ভাইও সুস্থ হয়ে গেল। অবশেষে, ঐ দুই ভাই খাবার ও খুশির খবর নিয়ে এলেন। তারা যোগাযোগ করতে পেরেছেন– আমাদের আনসার ভাইদের সাথে। আর অচিরেই তারা এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। ভাইয়েরা গাড়ি যোগে এসেছেন। এবং আমাদেরকে নিয়ে যেতে পূর্ণ এক রাত লেগেছে। আমরা শহরের ভিতরেই থাকতে লাগলাম। তাঁরা আমাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। অবশ্য, সবাই এক জায়গায়ই ছিলাম। অবশেষে দীর্ঘ পদব্রজের পর আমরা বিশ্রাম নিলাম।

তাদের আতিথেয়তায় আমরা দশ দিন থাকার পর, ভাইয়েরা বললেন– আমাদের সফরটা বাস যোগে সমাপ্ত করতে হবে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত আমরা বাসে চড়ে গেলাম। সেখানে কিছু ভাই ছিল– আমাদের অপেক্ষায়। তাঁরা গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। ফজরের পর আমরা সীমান্ত এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। এর পিছনে প্রায় বিশ মিটারের একটি নদী। বলা হল– পনের মিনিট আমাদেরকে পানি দিয়ে হাঁটতে হবে। তারপর সেখানে আমরা পাব– আমাদের জন্যে অপেক্ষমান গাড়ি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা নদী পথে অপর দেশে প্রবেশ করে, আমাদের জন্য অপেক্ষমান গাড়িতে আরোহণ করলাম। আর মূলতঃ এটি ছিল– চোরা পথে সফর। অবশেষে, কোনরূপ থামানো ব্যতীত তৃতীয় দেশে প্রবেশ করলাম। সেখানে বেশি দেরি না করে, আমাদের সফর শুরু হল– চতুর্থ দেশের দিকে। নিরাপত্তার খাতিরে আমরা বাসে আরোহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

চতুর্থ দেশে প্রবেশ করার পর, আমরা দুই গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন যায়গায় চলে গেলাম। ভাইয়েরা আমাদেরকে এখানে একটি সুন্দর বাড়িতে নিয়ে এল। এবং ভালোভাবে আমাদের মেহমানদারী করল। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! সেখানে আমরা দুই মাস অবধি অবস্থান করলাম– পাসপোর্টের অপেক্ষায়। আমাদের পরিচয় পত্র না থাকায় বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল।
পাসপোর্ট পেয়ে আমরা নিরাপদে বের হতে লাগলাম। সপ্তাহ খানেক পর আমরা অন্য দেশের উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করলাম। সেখানে মুজাহিদ ভাইয়েরা আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! তাঁরা আমাদের মেহমানদারী করল। রাতে গাড়িতে চড়িয়ে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন– মুজাহিদদের একটি এলাকায়। বাজারে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সে গাড়ির অপেক্ষায়; যে গাড়িতে চড়ে আমরা আমাদের তুর্কিস্তানি ভাইদের নিকট যাব! আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি; যখন দেখেছি– আমাদের আশপাশে ইসলামি নিদর্শন; যা জিহাদের ভূমি ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না।

অবশেষে, একদিন পর আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত 'আল হিজবুল ইসলামি আত-তুরকিস্তানি' এর ভাইদের কাছে পৌঁছলাম। এর প্রায় ঘন্টাখানেক পর আমরা গেলাম– মুজাহিদ ভাইদের একটি বাসস্থানে। আমরা খুবই আনন্দিত হলাম; যখন দেখলাম– ভাইদের কাছে প্রায় সকল ধরনের অস্ত্র আছে।

এক সপ্তাহ যাবৎ আমরা এক আনসার ভাইয়ের বাড়িতে থাকার পর, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অতঃপর এক সপ্তাহ পর ভাইয়েরা আমাদেরকে সেনা প্রশিক্ষণে নিয়ে গেলেন। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা প্রহরায় ও আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করলাম।

সবশেষে, আমি আমার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলব– "যখন তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে; তখন আল্লাহ তোমার জন্য পথ করে দিবেন। তোমাদের তুর্কি ভাইদের ৯০% সীমান্তপথে কোনরূপ পাসপোর্ট ব্যতীত জিহাদের ভূমিতে এসে পৌঁছেছে।"
আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

# কেমন হবেন একজন মুজাহিদের জীবন সঙ্গিনী?

-উনাইসা আহসান বুশরা

উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাযি. ও আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামিল- দু'জনই তো নারী ছিলেন। কিন্তু তাদের আপন কর্মের ব্যবধানে একজনের আবাস চিরস্থায়ী জান্নাত; আর অপরজন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রয়েছে মহা শাস্তির আবাসের ঘোষণা-

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

'অচিরেই সে (আবু লাহাব) লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও (উম্মু জামিল); কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়।' -সূরা লাহাব: ৩,৪

কি অপরাধ ছিল আবু লাহাবের স্ত্রীর? সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রুতায় লিপ্ত থাকত; আর ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে আপন স্বামীর সহযোগী ছিল।

আর উত্তম চরিত্রের অনুপমা নারী উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাযি. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম সহধর্মিনী; যিনি ইসলামের ভীতকে মজবুত করার লক্ষ্যে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের সম্পদ ব্যয় করতেন। যিনি ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে আপন স্বামীকে সান্তনার বাণী শোনাতেন। পৃথিবীর আর কোন নারী এতটা সুন্দরভাবে আপন স্বামীকে সান্তনার বাণী শোনাতে পারে নি। এ সান্তনার বাণী সত্যিই দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করে দেয়। হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল আ. তাঁর কাছে এলেন; এবং বললেন, 'পড়ো'! তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস আমার নেই'। অতঃপর জিবরাঈল আ. তাঁকে খুব শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ো'! তিনি আবারও বললেন, 'পড়ার অভ্যাস আমার নেই'। অতঃপর তৃতীয় বার জিবরাঈল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলিঙ্গন করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ো'!

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿1﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿2﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿3﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿4﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন (সবকিছু)। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। পড়! এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।' -সূরা আলাক: ১-৫

অহীর এ আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত হৃদয়ে খাদীজা রাযি.-এর কাছে ফিরে এলেন। তিনি খাদীজা রাযি. কে বললেন, 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও!' খাদীজা রাযি. তাঁকে শায়িত অবস্থায় কম্বল গায়ে দিয়ে দিলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতা ও চিত্ত চাঞ্চল্যের ভাব দেখে খাদীজা রাযি. তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কোন ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন! আল্লাহ কখনোই আপনাকে অপমান করবেন না। কেননা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় দান করেন।

মেহমানদের আদর-যত্ন করেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।' -আর রাহীকুল মাখতুম

নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে এমন সান্তনার বাণী শোনায়; দুঃখ-বেদনায় কি অন্তর ভারাক্রান্ত হতে পারে? এতো নিমিষেই অন্তরকে প্রশান্ত করে দেয়। যাদেরকে মহান রব দ্বীন বিজয়ের সৈনিক মুজাহিদদের স্ত্রী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন; আমাদের সে সব মুমিনা বোনদের জন্য এ ঘটনা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দ্বীন বিজয়ের লক্ষ্যে কিতালের পথে ইসলামের বীর সৈনিকদের অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ সইতে হয়; বহু বাধা-বিপত্তির পথ পাড়ি দিতে হয়। যে পথের পথিকদের পদে পদেই পরীক্ষা; তাঁদের জীবন সঙ্গিনীদের কেমন সহনশীলা হওয়া উচিত!? আর আপন স্বামীদের কেমন সান্তনার বাণী শুনিয়ে দ্বীন বিজয়ের পথে অটল-অবিচল রাখার ভূমিকা পালন করা উচিত!? হ্যাঁ! একজন মুজাহিদের স্ত্রীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল- পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে আপন স্বামীকে সান্তনার মাধ্যমে কিতালের ওপর উজ্জীবিত রাখা। কত সহজেই তো স্বামীর মাথায় কোমল হাত বুলিয়ে বলা যায়- 'দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ আপনাদের মুজাহিদ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এটা সত্য, এ পথে পরীক্ষা আসবে; কিন্তু আল্লাহ আপন-াদের পরাজিত করবেন না; ধ্বংস করে দিবেন না। তিনি আপনাদের ভালোবাসার সুসংবাদ দিয়েছেন; দিয়েছেন বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। আপনাদের হাতের দ্বারাই মহান রব ইসলামের শত্রুদের শাস্তি দিবেন; ধ্বংস করবেন জালিমদেরকে। আপনারাই তো মাজলুম উম্মাহর আর্তনাদ মুছে দিতে ছাহাবাদের প্রদর্শিত পথে হাঁটছেন। আপনারাই তো রক্তাক্ত উম্মাহর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে রণ সাজে সজ্জিত হয়েছেন। হীনবল হবেন না। আরও সামনে অগ্রসর হোন! আমাদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনাদের রবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা তো সেই মহান প্রতিপালকেরই ইবাদাত করি; যেই মহান সত্তার ওপর ভরসা করে ইবরাহীম আ. আপন স্ত্রী-সন্তানকে খাবার-পানীয় বিহীন মরুভূমিতে রেখে মহান রবের আদেশে বের হয়ে পড়েছেন। হে প্রিয় স্বামী! হে আমার চক্ষু শীতলকারী সন্তানের বাবা, আবু আবদুল্লাহ! আমি আপনার সন্তানদের মুজাহিদ হিসেবেই গড়ে তুলব, ইনশ-াআল্লাহ! আর অচিরেই তো আমাদের সাক্ষাত হবে; এ দুনিয়া থেকে উত্তম ভূমিতে। ইসলামের শত্রুদের নাপাক রক্ত প্রবাহিত করে আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করুন! ইসলামের শত্রুদের নাপাক রক্ত প্রবাহিত করে আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করুন! ইসলামের শত্রুদের নাপাক রক্ত প্রবাহিত করে আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করুন!

হে বোন! আমরা কি পারি না?– আপন স্বামীদের একটু সান্তনার বাণী শোনাতে! আমরা কি এ ইচ্ছে পূর্ণ করার পথে হাঁটতে পারি না?– আপন শহীদ স্বামীর সাথে চিরস্থায়ী মনোরম উদ্যানে আবাস গড়তে!

المرأة الصالحة

إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته

وإذا غاب عنها حفظته

সতী নারীর বৈশিষ্ট হচ্ছেঃ-

তাকে দেখলে স্বামীর মন প্রফুল্ল হয়, আদেশ করলে তা মান্য করে, স্বামীর অনুপুস্থিতিতে সবকিছু সংরক্ষণ করে।

المرأة الصالحة

أبو داود